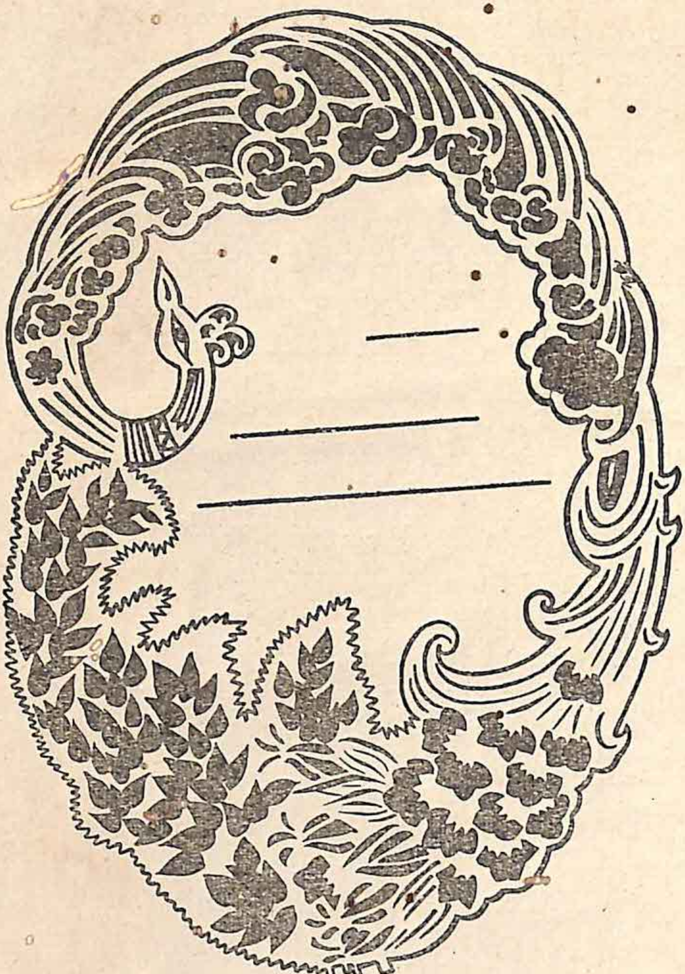
ছোটদের ভালো ভালো গল্প

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়



ছোটদের

ভালো ভালো গল্প

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী প্রকাশ ভবন
এ৬৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
১৩৬৮

প্রকাশিকা
শুক্লা দে
শ্রী প্রকাশ ভবন
এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ শিল্পী
চারু খান

মুদ্রক
কার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলকাতা-৬

দুই টাকা

শ্রীমান স্থপর্ণ ও কুমারী কঙ্কণা

দাদু

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ছোটদের ভালো ভালো গল্প

পান্না দিঘির জোড়া রুই

দূর থেকে দেখলে মনে হয় ঘোড়ার খুরের মত বাঁকা একটা উঁচু বাঁধ। আর তার কোলে টল্‌টল্ করছে পান্না দিঘির স্বচ্ছ জল।

বাঁধটা কিন্তু সত্যিকারের বাঁধ নয় ; যাকে বাঁধ বলে মনে হয়, হাজার বছর আগে সেটা ছিল রাজপ্রাসাদ। তিন দিক থেকে প্রকাণ্ড দিঘিকে ঘিরে রেখেছিল। প্রাসাদে থাকতেন রাজা, রানী, রাজকন্যা ; লোক-লস্কর দাস-দাসীতে চারিদিক গমগম করত। রানী এসে দিঘির পাথর বাঁধানো ঘাটে স্নান করতেন, রাজকন্যা পান্নার মত জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটতেন। এখন আর সেখানে জন-মানব নেই ; রাজ-অট্টালিকা ভেঙে ধ্বসে পড়েছে, তার ওপর বড় বড় গাছ গজিয়েছে। রাজা, রানী, রাজকন্যা স্বপ্নের মত অতীতের ছায়ায় মিলিয়ে গেছেন। কেবল পান্না দিঘির সবুজ জল আজও আগের মতই টল্ টল্ করছে।

দিঘির যেদিকে বাঁধ নেই সেই দিকে কিছু দূরে একটি ছোট গ্রাম। গ্রামের বৌ-ঝি'রা দিঘি থেকে জল নিতে আসে। পান্না দিঘির জল ঝাঁঝি আর শ্যাওলায় ভরে গেছে, তবু এমন মিষ্টি জল আর কোথাও নেই ; যেন মিছরির সরবৎ। তাই গাঁয়ের মেয়েরা এখান থেকেই জল নিয়ে যায়।

পশ্চিমের আকাশে যখন সন্ধ্যের আলো ঝিল্‌মিল্ করে, তখন গ্রামের মেয়েরা জল নিতে আসে। দিঘির পাথর বাঁধানো পৈঠের ওপর বসে দু'দণ্ড গল্প করে। হঠাৎ কোনও কোনও দিন তারা দেখতে পায়, এক জোড়া প্রকাণ্ড রুই মাছ ঘাটের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে ;

কখনও ঘাটের খুব কাছে আসছে, কখনও গভীর জলে চলে যাচ্ছে। তাদের গায়ে যেন সোনার সাঁজোয়া পরা।

এই জোড়া রুই মাছ দেখে মেয়েরা গল্প বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে। তাদের মনে পড়ে যায় কত দিনের পুরনো রূপকথা, যা তারা নিজেদের মা-ঠাকুমা'র মুখে শুনেছে। সন্ধ্যের ঝিমিয়ে-পড়া আলোয় ভাঙা রাজপুরী আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে।

পান্না দিঘিতে তখন অনেক মাছ ছিল। রাজকুমারী মধুমতী মাছ খেতে ভালবাসেন, তাই রাজা দিঘিতে নানা জাতের মাছ ছাড়ার ব্যবস্থা করেছেন। রুই কাৎলা চিতল, আরও কত কি। মধুমতীর যখন যে মাছ খাবার ইচ্ছে হয়, জেলেরা এসে জাল ফেলে সেই মাছ ধরে দিয়ে যায়।

দিঘিতে একটি মাছ ছিল, তার চেহারা ভারি সুন্দর। গোলাপী রঙ, নধর গড়ন। তাকে দেখে মনে হয় উঁচু বংশের মাছ। সে অন্য মাছেদের সঙ্গে মেশে না, ঘাটের কিনারায় কিনারায় ঘুরে বেড়াত।

একদিন সে দেখতে পেল মধুমতী সখীদের নিয়ে ঘাটে জলকেলি করছেন। তার চোখের আর পলক পড়ল না, সে মধুমতীর পানে চেয়ে রইল। কী রূপ মধুমতীর! যেন পান্না দিঘির সবুজ জলে সোনার পদ্ম ফুটে আছে।

সেদিন থেকে মাছ আর ঘাট ছেড়ে যায় না। যখনই মধুমতী স্নান করতে আসেন, জলের ভেতর থেকে পলকহীন চোখে তাঁর পানে চেয়ে থাকে। তিনি যখন সাঁতার কাটেন, সেও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

রাজকুমারীর সখীরা বলে, 'ওমা, কি সুন্দর রুইমাছ, ঠিক যেন রাজপুত্তুর!'

মধুমতী হেসে বলেন, 'ও যদি মাছ না হয়ে মানুষ হত, ওর গলায় মালা দিতুম।'

শুনে মাছের খুব আনন্দ হয়। আবার দুঃখও হয়। জলের মাছের তো ডাঙার মানুষের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না।

এমনিভাবে দিন কাটে।

মাছের দেবতা হচ্ছেন মীনেশ্বর; সাক্ষাৎ মৎস্য অবতার। দিঘির অতল তলে ঝিনুকের মন্দিরে তিনি থাকেন। একদিন মাছ গিয়ে তাঁর দোরে ধর্ণা দিল।

'ঠাকুর, আমাকে মানুষ করে দাও।'

কিন্তু মাছের মানুষ হওয়া তো সহজ কথা নয়। মীনেশ্বর তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন না। মাছও নাছোড়বান্দা, ধর্ণা দিয়ে পড়ে রইল। খায় না দায় না, কেবল বলে, 'ঠাকুর, আমাকে মানুষ করে দাও।' না খেয়ে খেয়ে তার শরীর আধখানা হয়ে গেল।

শেষে তার অবস্থা দেখে মীনেশ্বরের দয়া হল। মীনেশ্বর বললেন, 'আচ্ছা যা, বর দিলাম, ডাঙায় উঠলেই তুই মানুষ হয়ে যাবি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস্—মানুষ হবার পর মাছ খাবি না। মাছ খেলেই আবার মাছ হয়ে যাবি।'

মাছ রাজি হল। মীনেশ্বরকে প্রণাম করে সে তাড়াতাড়ি জলের ওপর ভেসে উঠল। তার আর ত্বর সইছে না, কোনও রকমে ডাঙায় উঠতে পারলে হয়।

ওদিকে পান্না দিঘির কিনারায় তখন মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে। রাজকন্যার পাকা রুইমাছের ঝোল খাবার ইচ্ছে হয়েছে, তাই জেলেরা জাল নিয়ে দিঘিতে মাছ ধরতে এসেছে। কিন্তু যত বার জাল ফেলছে —রুইমাছ উঠছে না। উঠছে কাৎলা, মৃগেল, কালবোস।

তারপর আমাদের রুইমাছ যেই ভেসে উঠেছে অমনি ঝপাং করে জাল পড়ল। আর যাবে কোথায়। জেলেরা জাল টেনে ডাঙায় তুলল। জালের মধ্যে সোনার বরণ রুইমাছ ধড়্‌ফড়্ করছে।

তারপরই—অবাক কাণ্ড!

জাল ডাঙায় তোলার সঙ্গে সঙ্গে—কোথায় রুইমাছ! তার বদলে জালের মধ্যে জড়িয়ে আছে এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষ।

জেলেরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে জাল ফেলে মারল টেনে দৌড়।

রাজকুমারী মধুমতী তিন তলার জানলায় দাঁড়িয়ে মাছ ধরা দেখছিলেন, জেলেরা জাল ফেলে পালিয়ে গেল দেখে তিনি নেমে এলেন। ঘাটে এসে দেখলেন, জালে জড়িয়ে আছে সোনার বরণ রাজকুমার; তার কানে শঙ্খের কুণ্ডল, হাতে শঙ্খের বাজুবন্ধ। রাজকুমারীকে দেখে সে হাসল। মধুমতীও হাসলেন, চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়ে জালের বাঁধন খুলে দিলেন। বললেন, 'তুমি কে?'

সে বলল, 'আমি শঙ্খপুরীর রাজপুত্র, আমার নাম শঙ্খকুমার।'

মধুমতীর চোখ দুটি আনন্দে নেচে উঠল।

ওদিকে রাজসভায় রাজা খবর পেয়েছিলেন। তিনি ব্যস্তসমস্ত ভাবে এসে দেখলেন, ঘাটের পৈঠের ওপর মধুমতীর পাশে এক কন্দর্পকান্তি যুবা বসে আছে। রাজা বললেন, 'একি! অন্দরমহলের ঘাটে তুমি কে?'

শঙ্খকুমার রাজাকে নিজের পরিচয় দিলেন। রাজা বললেন, 'শঙ্খকুমার, তুমি এখানে এলে কি করে?'

শঙ্খকুমার বললেন, 'পান্না দিঘি থেকে শঙ্খপুরী পর্যন্ত জলের তলায় সুড়ঙ্গ আছে, আমি সেই পথে এসেছি।'

রাজা বললেন, 'কিন্তু নিজের রাজ্য ছেড়ে এখানে এলে কেন?'

শঙ্খকুমার বললেন, 'শঙ্খপুরীতে মানুষ নেই; সেখানে মন টেঁকেনা। তাই মানুষের রাজ্যে এসেছি।'

রাজা খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ, মনের আনন্দে বাস কর। তুমি যখন রাজপুত্র, তখন আমার প্রাসাদেই থাকো।'

শঙ্খকুমার রাজপ্রাসাদে রইলেন। দাস-দাসীরা সেবা করে, রানী-মা আদর করে সামনে বসিয়ে খাওয়ান। শঙ্খকুমার ক্ষীর সর নবনী খান, কেবল মাছ খান না। রাজার পাকশালে রুই মাছের ঝোল, চিতল মাছের ঝাল রান্না হয়, শঙ্খকুমার তা স্পর্শ করেন না। রানী-মা বলেন, 'আহা, কেন বাছা তুমি মাছ খাওনা ?'

শঙ্খকুমার বলেন, 'মাছ আমার ভাল লাগেনা।'

মধুমতী মনে মনে ভাবেন, ওমা এমন মানুষও আছে, যার মাছ ভাল লাগেনা !

যাহোক, শঙ্খকুমার মনের সুখে আছেন, যেন ঘরের ছেলে। রোজ পান্না দিঘিতে স্নান করতে নামেন। মধুমতীও স্নান করতে আসেন ; দুজনে মিলে বিরাট দিঘির এপার ওপার সাঁতার কাটেন। মনে হয়, যেন দুটি রাজহংস দিঘির সবুজ জলে খেলা করে বেড়াচ্ছে।

একদিন হল কি, মধুমতী আগে দিঘির ঘাটে স্নান করতে এসেছেন ; তিনি দেখলেন দিঘির ঠিক মাঝখানে একটি সুন্দর নীল পদ্ম ফুটেছে। মধুমতীর ইচ্ছে হল তিনি ওই পদ্মটি তুলে আনবেন, আর শঙ্খকুমার যখন আসবেন তখন তাঁকে সেটি দেবেন। মধুমতী জলে নামলেন, সাঁতরে ফুলটি তুলতে গেলেন। কিন্তু যেই তিনি ফুলটি তোলবার জন্য হাত বাড়িয়েছেন, অমনি পদ্মের ভেতর থেকে একটা কালো ভোমরা বেরিয়ে তাঁর আঙুলে হুল ফুটিয়ে দিলে।

অমনি মধুমতীর হাতে খিল ধরল ; তিনি আর ভেসে থাকতে পারলেন না, ডুবে যেতে লাগলেন। এই সময় শঙ্খকুমারকে ঘাটে দেখতে পেয়ে মধুমতী ডাকলেন, 'শঙ্খকুমার আমি ডুবে যাচ্ছি, আমাকে বাঁচাও।'

শঙ্খকুমার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, পলকের মধ্যে সাঁতার কেটে গিয়ে মধুমতীকে জল থেকে তুলে আনলেন।

রাজা রানী এলেন। রানী মেয়েকে বুকে চেপে ধরলেন, রাজা শঙ্খকুমারকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কুমার, কি পুরস্কার চাও, বল।'

শঙ্খকুমার হাসি-মুখে কুমারী মধুমতীর দিকে আঙুল দেখালেন। রাজা বললেন, 'ভাল। তুমি মধুমতীর প্রাণ বাঁচিয়েছ, ওকে তোমার হাতেই দিলাম।'

তারপর মহা ধুমধাম। আলো-বাতি, বাজনা-বাদ্যি, নাচ-গান। রাজকন্যা মধুমতীর সঙ্গে শঙ্খকুমারের বিয়ে হয়ে গেল।

দু'জনে মনের আনন্দে আছেন। সোনালী দিন কাটে তো রূপালী রাত আসে। শীত কাটে তো বসন্ত আসে। ফুল ঝরে তো ফল ফলে। রাজবাড়িতে দিনে দোল, রাত্রে দেয়ালী। সুখের গাঙে যেন বান ডেকেছে।

কিন্তু মধুমতীর মনে একটি ছোট্ট কাঁটা ফুটে আছে—স্বামী মাছ খান না। মধুমতী নিজে মাছ ভালবাসেন, কিন্তু স্বামীর মাছে রুচি নেই তাই তাঁরও মাছ খেতে ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে স্বামীকে বলেন, 'তুমি মাছ খাবেনা?'

শঙ্খকুমার বলেন, 'না।'

'একবার খেয়ে দেখ না, খুব ভাল লাগবে।'

'না।'

মধুমতী নিঃশ্বাস ফেলেন, তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে। শঙ্খকুমার বলেন, 'চল, অশোক গাছে দোলা বেঁধেছি, দু'জনে মিলে দুলব।'

এমনি করে দিন কাটে।

রাজার পাকশালে এক রাঁধুনী ছিল, সে মাছ রাঁধত। সে একদিন মধুমতীকে বলল, 'রাজকুমারী, স্বামী মাছ খাননা বলে তুমিও মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ, তবে আর কার জন্য রাঁধি।'

মধুমতী বললেন, 'কি করি বল্ !'

রাঁধুনী বলল, 'একটা উপায় করতে পারি। এমনভাবে মাছ রাঁধব যে, শঙ্খকুমার বুঝতেই পারবেন না যে মাছ খেয়েছেন। এমনি ভাবে খেতে খেতে অভ্যেস হয়ে যাবে। তখন চেয়ে মাছ খাবেন।'

রাঁধুনীর কথা মধুমতীর মনে ধরল, বললেন, 'তাই কর্ তাহলে।'

রাঁধুনী তখন কোমরে আঁচল জড়িয়ে মাছ রাঁধতে চলল।

সেদিন দুপুরবেলা শঙ্খকুমার খেতে বসেছেন। সোনার থালা ঘিরে বাটিতে ছত্রিশ ব্যঞ্জন। মধুমতী মুক্তার ঝালর বসানো পাখা দিয়ে বাতাস করছেন। খেতে খেতে শঙ্খকুমার বললেন, 'এটা কিসের তরকারি ?'

মধুমতী বললেন, 'ওটা ধোঁকার ডালনা। নতুন রান্না, খেয়ে দেখ, খুব ভাল লাগবে।'

শঙ্খকুমার না জেনে মাছ মুখে দিলেন।

অমনি তাঁর বুক ধড়ফড় করে উঠল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আসন থেকে উঠে তিনি টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দিঘির দিকে চললেন।

মধুমতী 'কি হল! কি হল!' বলে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পিছন পিছন ছুটলেন।

দিঘির ঘাটে গিয়ে শঙ্খকুমার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অমনি —কোথায় শঙ্খকুমার! শঙ্খকুমার মাছ হয়ে পান্না দিঘির অগাধ জলে মিলিয়ে গেলেন!

মধুমতী কাঁদতে কাঁদতে ঘাটের ওপর লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর কান্না শুনে রাজা রানী ছুটে এলেন, ঘাটে দাস-দাসীর ভীড় জমে গেল। সকলের মুখে এক কথা, 'কি হল! কি হল! কোথায়—কোথায় গেল শঙ্খকুমার!'

মধুমতী আর মহলে ফিরে গেলেন না, ঘাটেই পড়ে রইলেন। দিন যায়, রাত যায় ; মধুমতী দিঘির জলের পানে চেয়ে কেবল কাঁদেন। কেঁদে কেঁদে তাঁর চক্ষু অন্ধ হল। তারপর একদিন তিনিও জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর দেহ পান্নাদিঘির অগাধ জলে ডুবে গেল।

রাজপুরীতে সুখের দিন ফুরোল। দেশে দুর্ভিক্ষ এল, মড়ক এল, রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধল। রাজ্য ছারখার হয়ে গেল।

তারপর হাজার বছর কেটে গেছে। রাজার প্রাসাদ ভেঙে পড়েছে। কিন্তু পান্না দিঘির সবুজ জল এখনও টলটল করছে। সন্ধ্যেবেলা যখন জলের ওপর সোনালী আলো ঝিল্‌মিল্‌ করে, গাঁয়ের বৌ-ঝি'রা দেখতে পায় দুটি প্রকাণ্ড রুই মাছ জলের কিনারায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবার গভীর জলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

আঙুর-পরী ডালিম-পরী

এক রাজা। প্রকাণ্ড তাঁর রাজ্য। হাতিশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে সোনা-দানা হীরা-মুক্তার ছড়াছড়ি। রাজার প্রতাপে রাজ্য গম্‌গম্‌। রাজ্যটি কিন্তু রাজার নিজের নয়; অপর এক রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন—পুরনো রাজা-রানীকে কেটে, তাঁদের রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করছেন।

চাঁপার কলির মত পুরনো রাজার দুটি কচি মেয়ে ছিল; নতুন রাজা এক ডাইনী-বুড়ীর হাতে তাদের দিয়ে বলেছিলেন, 'বনের মধ্যে এদের পুঁতে রেখে আয়।'

রাজ্যের সীমানায় মায়া-বন। ডাইনী-বুড়ী চাঁপার কলির মত মেয়ে দুটিকে নিয়ে সেই যে মায়া-বনে ঢুকেছিল, আর ফিরে আসে নি।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। পুরনো রাজা-রানী আর রাজকন্যাদের কথা কারো মনে নেই। নতুন রাজা রাজত্ব করেন। তাঁর দুই ছেলে বড় হয়ে উঠেছেন, তাঁদের নাম—বড় কুমার আর ছোট কুমার। সোনার কার্তিকের মত তাঁদের চেহারা; ফুলের মত তাঁদের মন। রাজা-রানী তাঁদের দেখেন—আর চোখ জুড়িয়ে যায়।

রাজা ভাবেন, আহা, পুরনো রাজার মেয়ে দুটি যদি থাকতো, এদের সঙ্গে বিয়ে দিতুম। রাজার মনে দুঃখ হয়।

রানী ভাবেন, আহা, অন্য কোনো রাজা এসে যদি আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়ে আমার সোনার চাঁদ ছেলে দুটিকে বনে পুঁতে রেখে আসে! আতঙ্কে তাঁর গা কাঁপে।

রাজা-রানী কারো মনে সুখ নেই।

একদিন রাজা একলা মায়া-বনে মৃগয়া করতে গেলেন। প্রকাণ্ড বন; গাছে-লতায় আলো-ছায়ায় জড়াজড়ি। হাতী শুঁড় দুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়; হরিণ শিংয়ের বাহার নিয়ে ছুটোছুটি করে; আরো কত জন্তু-জানোয়ার বনে থাকে। কিন্তু সেদিন রাজা ঘোড়ায় চ'ড়ে শিকার খুঁজে বেড়ালেন, মায়া-বনের হরিণ চোখের সামনে বাতাসে মিলিয়ে গেল, মারতে পারলেন না; মায়া-বনের ময়ূর পেখমের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল, রাজা ধরতে পারলেন না।

সারাদিন ঘুরে-ঘুরে রাজা শেষে এক লতার ঝোপের কাছে গিয়ে ঘোড়া থামালেন। পিপাসায় তাঁর বুক শুকিয়ে গেছে—কিন্তু জল কোথায়? ক্ষুধায় নাড়ী চুঁইয়ে গেছে—কিন্তু কি খাবেন? রাজার ক্লান্ত হাত থেকে বল্লম খ'সে পড়লো।

ঘোড়া থেকে নেমে রাজা এদিক্-ওদিক্ চাইলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো, একটি আঙুরের লতা, একটি ডালিম গাছকে জড়িয়ে-জড়িয়ে উঠেছে। আঙুর-লতায় এক-থোলো পাকা আঙুর ঝুলছে, আর ডালিম ফ'লে আছে একটা।

রাজা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন; লতা থেকে আঙুর পেড়ে খেয়ে ফেললেন। তৃষ্ণা নিবারণ হলো, ক্ষুধাও মিটলো। তারপর ডালিম ফলটি পেড়ে আবার ঘোড়ায় চ'ড়ে রাজা রাজপুরীতে ফিরে চললেন।

সন্ধ্যেবেলা রাজা পুরীতে ফিরে গেলেন। রাজার হাতে মায়া-বনের রাঙা টুক্‌টুকে ডালিম দেখে রানী বললেন, 'ওমা! অত সুন্দর ডালিম কোথায় পেলে?'

রাজা বললেন, 'তোমার জন্যে বন থেকে এনেছি।'

রানী ভারি খুশি হয়ে ডালিমটি ভেঙে খেলেন।

দিন কাটতে লাগলো। ক্রমে রাজার শরীর খারাপ; রানীর

শরীরে বল নেই। কবিরাজ এলেন। কিন্তু রাজা-রানীর কি রোগ হয়েছে কেউ বল্‌তে পারে না। রাজা ও রানী রাত্রিবেলা অকাতরে ঘুমোন, কিন্তু দিনেরবেলা তাঁদের শরীরে স্বস্তি নেই। কি যেন তাঁদের শরীরের মধ্যে ব'সে গুম্‌রে-গুম্‌রে কেঁদে বলে, মুক্তি দাও। কেন আমাদের বন থেকে ধ'রে নিয়ে এলে!

রাজা-রানীর আহার নেই; দিন-দিন তাঁরা শুকিয়ে যেতে লাগলেন। রাজ্যময় সবার দুশ্চিন্তা, রাজা-রানী বুঝি আর বাঁচবেন না।

রাজা বললেন, 'রাণি, কোন্ পাপে আমাদের এমন হলো?'

রানী বললেন, 'মনে নেই? পরের রাজ্য কেড়ে নিয়ে—পরের মেয়ে দুটিকে বনে পুঁততে পাঠিয়েছিলে? সেই পাপে আমাদের এই দশা! কিন্তু আমরা মরি সে ভালো, আমাদের ছেলেরা যেন সুখে থাকে!'

ক্রমে রাজা-রানীর অবস্থা যায়-যায়; বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারেন না। তাই দেখে রাজকুমারদের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। ছোট কুমার বললেন, 'দাদা, মা-বাবা তো চললেন। এসো, দু'জনে বাপ-মায়ের সেবা করি।'

বড় কুমার বল্‌লেন, 'হ্যাঁ ভাই, এসো, তাই করি। প্রাণ দিয়েও যদি বাবা-মাকে বাঁচাতে পারি, তাও করবো।'

দুই কুমার প্রাণপণে রাজা-রানীর সেবা করেন! রাত্রে রাজা-রানী পালঙ্কে শুয়ে ঘুমোন, দুই ভাই জেগে পাহারা দেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হয়, রাজপুরী নিশুতি হয়ে আসে। রাজকুমারদের চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসে; তাঁরা পালঙ্কের শিথানে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন।

এমনিভাবে রাত কাটে। দুপুর রাত্রে রাজার ঘরে কী ঘটে কেউ জানতে পারে না। হঠাৎ একদিন নিঝুম রাত্রে রাজকুমারদের ঘুম ভেঙে গেল। তাঁরা চোখ মেলে দেখেন—ঘুমন্ত রাজার নাক থেকে

বেরিয়ে এলো সবুজ রঙের একটি ছোট্ট পরী; আর রানীর নাক থেকে বেরিয়ে এলো ডালিম-ফুলের মতো রাঙা একরত্তি একটি পরী। রাজপুত্রেরা মিটিমিটি চেয়ে দেখলেন, ছোট্ট পরী দুটি মেঝেয় নেমে খেলা করতে লাগলো…হাত ধরাধরি ক'রে মনের আনন্দে নাচতে লাগলো। দুই রাজকুমার তখন চুপি-চুপি উঠে পরীদের ধ'রে ফেললেন; তারা আর পালাতে পারলো না।

বড় রাজকুমার বললেন, 'তোমরা কে?'

সবুজ-পরী বললে, 'আমি আঙুর-পরী।'

রাঙা-পরী বললে, 'আমি ডালিম-পরী।'

ছোট কুমার বললেন, 'তোমরা কোথায় থাকো?'

সবুজ-পরী বললে, 'আমি রাজার পেটের মধ্যে থাকি।'

রাঙা-পরী বললে, 'আমি রানীর পেটের মধ্যে থাকি। আমরা দুই বোন। দিনেরবেলা রাজা-রানী জেগে থাকেন তাই বেরুতে পারি না; রাত্রে তাঁরা ঘুমোলে, দু'জনে বেরিয়ে খেলা করি।'

বড় কুমার বললেন, 'বুঝেছি। তোমাদের জন্যেই মা-বাবার অসুখ। তোমাদের মেরে ফেলবো।'

আঙুর-পরী আর ডালিম-পরী তখন কাঁদতে লাগলো; বললে, 'আমাদের মেরো না; আমরা কোনো দোষ করিনি। মায়া-বনে আমরা আঙুর আর ডালিম হয়ে ফলেছিলুম। বাতাস এসে আমাদের দোলা দিতো—আমরা মনের সুখে খেলা করতুম। রাত্রে লতায়-পাতায় জড়াজড়ি ক'রে ঘুমিয়ে থাকতুম। একদিন রাজা মৃগয়া করতে গিয়ে আঙুর পেড়ে খেলেন আর ডালিমটি রানীর জন্যে নিয়ে এলেন। সেই থেকে আমরা তাঁদের পেটের মধ্যে আছি।'

বড় কুমার বললেন, 'তবে উপায়?'

দুই কুমার গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

তারপর ছোট কুমার বললেন, 'চলো দাদা, ওদের চুপি-চুপি মায়া-বনে রেখে আসি।'

বড় কুমার বললেন, 'সেই ভালো।'

দুই রাজপুত্র তখনি ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরুলেন। বড় কুমার আঙুর-পরীকে নিজের পাগড়ীর মধ্যে বেঁধে নিলেন, ছোট কুমার ডালিম-পরীকে কোমরবন্ধে লুকিয়ে নিলেন। মায়া-বন অনেক দূর ; যেতে যেতে সকাল হয়ে গেল।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে রাজা-রানী দেখেন, রাজকুমারেরা নেই, ঘোড়ায় চ'ড়ে মায়া-বনে চলে গেছেন। তাঁরা ভাবলেন, কুমারেরা তাঁদের পাপের কথা জানতে পেরেছেন, তাই রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন। রাজা বুক চাপড়াতে লাগলেন ; রানী কপালে কঙ্কণ মারলেন। রাজ্যে কারো প্রাণে সুখ রইলো না ; রাজকুমারদের সকলেই ভালোবাসতেন, দুঃখে শোকে সকলে হায়-হায় করতে লাগলেন।

এদিকে দুই রাজপুত্র মায়া-বনে গিয়ে পৌঁছুলেন। কিন্তু কোথায় ডালিম-গাছ ! কোথায় আঙুর-লতা ? খুঁজতে-খুঁজতে তাঁরা সেই জায়গায় গেলেন। দেখলেন, ডালিম-গাছ, আঙুর-লতা কিছুই নেই ; বনের হাতী আঙুর-লতা উপড়ে ফেলে দিয়েছে, বনের সজারু ডালিম-গাছের শিকড় খেয়ে গেছে। চারদিক শূন্য ; কেউ কোথাও নেই ! একটা ফড়িং কি ভোমরা পর্যন্ত নেই। কাকে জিজ্ঞাসা করেন ?

এদিকে-ওদিকে চাইতে-চাইতে ছোট কুমার দেখলেন, তুঁত-গাছের ডালে রেশমের একটি গুটি ঝুলছে। তিনি গুটির কাছে গিয়ে বললেন, 'গুটিপোকা, গুটিপোকা, বলতে পারো, আঙুর-লতা কোথায় ? ডালিম-গাছ কোথায় ?'

গুটির ভেতর থেকে পোকা বললে, 'আঙুর-লতা নেই, ডালিম-গাছ নেই, হাতীতে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, সজারু গোড়া খেয়ে গেছে।'

বড় কুমার বললেন, 'তবে উপায়? আঙুর-পরী ডালিম-পরীকে তা'লে রাখি কোথায়?'

রাজকুমারদের ভারি ভাবনা হলো। কোথায় রাখেন পরীদের? বনে ছেড়ে দিলে হয়তো ইঁদুরে-বাঁদরে তাড়া করবে নয়তো চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। তখন কি হবে? রাজকুমারদের বড় দয়া হলো। আহা, ছোট্ট পরী দুটিকে কী ক'রে এই বনে ফেলে যাবেন!

তাঁরা ভাবতে লাগলেন।

তখন গুটিপোকা বললে, 'রাজকুমার; আমি তোমাদের চিনি; পরীদেরও চিনি। আমারই পাপে ওরা একরত্তি পরী হয়ে বনে লুকিয়েছিল। তোমরা ওদের উদ্ধার করো।'

রাজকুমারেরা অবাক্ হয়ে বললেন, 'তুমি কে?'

গুটিপোকা বললে, 'আমি ডাইনী-বুড়ী। তোমাদের বাবার হুকুমে আমি পুরনো রাজার দুই মেয়েকে এনে মাটিতে পুঁতেছিলুম; তাই আমি গুটিপোকা হয়ে নিজের জালে জড়িয়ে বন্ধ হয়ে আছি। আর যাদের মাটিতে পুঁতেছিলুম তারা আঙুর আর ডালিমগাছের ফল হয়েছিল। তোমরা ওদের উদ্ধার করো।'

দুই কুমার বললেন, 'কি ক'রে উদ্ধার করবো?'

গুটিপোকা বললে, 'রক্ত দিয়ে....বুকের রক্ত দিয়ে। রাজার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করো, তবেই রাজকন্যারা উদ্ধার পাবে।'

বড় কুমার কোমর থেকে তলোয়ার বার ক'রে নিজের বুকে মারলেন....এক ঝলক্ রক্ত মাটিতে পড়লো। অমনি দেখতে দেখতে আঙুর-পরী পরমাসুন্দরী রাজকন্যা হয়ে সামনে দাঁড়ালো!

ছোট কুমার কোমর থেকে তলোয়ার নিয়ে নিজের বুকে

মারলেন....এক ঝলক রক্ত মাটিতে পড়লো। অমনি ডালিম-পরী রাঙা টুক্‌টুকে রাজকুমারী হয়ে তাঁর পানে চেয়ে হাসতে লাগলো।

বড় কুমার বললেন, 'এ কি আশ্চর্য ব্যাপার!'

ছোট কুমার বললেন, 'এত সুন্দর রাজকুমারী তো কখনো দেখিনি!'

আঙুর-কুমারী হাসতে হাসতে নিজের গলা থেকে মুক্তার মালা নিয়ে বড় কুমারের গলায় পরিয়ে দিলো। ডালিম-কুমারী লজ্জায় রাঙা হয়ে নিজের গলার মালা ছোট কুমারের গলায় দিলো।

তখন দুই রাজপুত্র দুই রাজকন্যাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে রাজ্যে ফিরে গেলেন।

নিরানন্দ রাজ্য আবার হেসে উঠলো।

রাজপুরীতে শানাই বাজলো।

রাজার আর অসুখ রইলো না। তিনি ছুটতে ছুটতে এসে ছেলেদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজ-কন্যাদের দেখে বললেন, 'আহা, কি সুন্দর মেয়ে! এরা কারা?'

কুমারেরা বললেন, 'ওরা পুরনো রাজার কন্যা। মায়া-বন থেকে উদ্ধার ক'রে এনেছি।'

শুনে আনন্দে রাজার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

রানী-মা অন্দরমহল থেকে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে এসে ছেলেদের বুকে নিলেন; দুটি ফুলের মতো রাজকন্যা দেখে বললেন, 'এ কাদের এনেছিস বাবা?'

কুমাররা হেসে বললেন, 'তোমার জন্যে দাসী এনেছি।'

রানী দুই বৌকে কোলে নিয়ে চুমু খেলেন! রাজ্যে জয়ডঙ্কা বেজে উঠলো। রাজা-রানীর বুকে আহ্লাদ ধরে না। দুই রাজকুমার দুই পরমাসুন্দরী রাজকন্যা নিয়ে আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। রাজ্যে কারো মনে আর দুঃখ রইলো না।

তারপর একদিন রাজ্য দুই ভাগ ক'রে দুই কুমারকে দিয়ে রাজা বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন ; রানীকে নিয়ে মায়া-বনে কুটীর বেঁধে শান্তিতে বাস করতে লাগলেন।

* * * *

ডাইনী-বুড়ী গুটিপোকা হয়ে আরো অনেক দিন গাছে ঝুলে রইলো। যেদিন তার পাপ ক্ষয় হলো সেদিন সে গুটি কেটে একটি কালো প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল।

তোমরা জান না, সে অনেক দিনের কথা, তখন ভারতবর্ষে প্রথম রেল এসেছে। সেই সময় একবার মৃত্যু দেবতার ক্রূর দৃষ্টি এই বাংলা দেশের উপর পড়েছিল। দেয়ালীর সময় যেমন পোকা মরে তেমনি মানুষ ম'রে দেশ একেবারে শ্মশান হয়ে গিয়েছিল।

নির্জিত নিস্তেজ জাতির উপর বিধাতার এই ক্রোধ যে মহামারীরূপ ধরে দেখা দেবে এ কেউ কল্পনা করতে পারে নি। শুধু পশ্চিমবাংলায় গঙ্গার ধারের একটি গ্রামে একজন লোক তার ইসারা পেয়েছিল।

গ্রামটি বেশ বর্ধিষ্ণু। মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ এই গ্রামের সবচেয়ে বড় গৃহস্থ। তার ক্ষেত খামার পুকুর বাগান হাল গরু অনেক আছে। গ্রামের সকলে তাকে ভারি শ্রদ্ধা করে। সে ভারি ভাল লোক, বিষয় বুদ্ধিও যেমন আছে তেমনি শরীরে দয়া মায়ারও অভাব নেই।

সে সময় গ্রামের পাশ দিয়ে রেল লাইন যাবার উঁচু বাঁধ তৈরী হচ্ছিল—হাজার হাজার কুলি তাতে কাজ করত, গ্রামের কাছেই তারা ছাউনি ফেলে থাকত; দিনের বেলায় তাদের কোদাল কুড়ুল গাঁইতির শব্দে চারিদিক চঞ্চল হয়ে উঠত আর রাত্রে তাদের ছাউনির হাজার হাজার আলো গ্রাম থেকে আলেয়ার মত বোধ হত।

গ্রামের লোকেরা হাঁ করে তাদের কাজ দেখত আর ভাবত, না জানি এসব কি হচ্ছে। রেল তারা কখনো দেখেনি তাই এই উঁচু পাড়ের অর্থ কিছুই আন্দাজ করতে পারত না; কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ বুদ্ধিমান লোক ছিল, সে মাথা নেড়ে বলত, 'এসব ভাল ব্যবস্থা নয়,

কোম্পানী মাটি কেটে জাঙ্গাল তৈরী করছে, বর্ষার জল বেরুতে পারবে না ; তখন দেশের কি অবস্থা হবে !'

কিন্তু তার কথা কে শুনবে ? ক্রমে কুলিরা কাজ করতে করতে এগিয়ে গেল, পড়ে রইল শুধু তাদের তৈরী লম্বা উঁচু বাঁধটা। তার পাশে ছোট ছোট গাছ গজাতে সুরু করল, গাঁয়ের ছেলেরা তার উপর উঠে খেলা করত। আস্তে আস্তে জিনিসটা সকলেরই গা-সওয়া হয়ে গেল।

এমনি ভাবে চার পাঁচ মাস কেটে গেল।

বৈশাখ মাসে একদিন সন্ধ্যার পর মৃত্যুঞ্জয় নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসে থেলো হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিল আর ঝিমচ্ছিল।' এক পায়রা-মটর আফিম্ খাওয়া তার অভ্যাস ছিল—তার উপর হুঁকোয় মৃদু মন্দ টান দিতে দিতে মৌতাত বেশ জমে এসেছিল। এমন সময় খট্-খট্ শব্দ শুনে চমকে উঠে মৃত্যুঞ্জয় দেখলে প্রকাণ্ড লম্বা একটা লোক লাঠি হাতে করে সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে তার চেহারা দেখা গেলনা, মৃত্যুঞ্জয় ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'কি চাও ? কে তুমি ?'

'অতিথি।'

অপরিচিত লোকটার গলার আওয়াজ শুনে মৃত্যুঞ্জয়ের হাড়ের ভিতরে মজ্জা পর্যন্ত যেন জমে গেল, এমন আওয়াজ সে জীবনে কখনো শোনেনি। 'তুই থুলি মুই থুলি' পাখীর ডাক শুনেছ ? ঠিক সেই রকম আওয়াজ—কাণে গেলেই গা শিউরে ওঠে। মৃত্যুঞ্জয় কোনরকমে হাতের হুঁকোটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথা থেকে আসা হচ্চে ?'

'ওপার থেকে।'

মৃত্যুঞ্জয় মনে করলে গঙ্গার ওপার থেকে। সে তখন চাকর ডেকে আলো আনতে বল্‌লে। অতিথি অভ্যাগত মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীতে প্রায়ই আসত—কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যেত না, আগন্তুকদের থাকবার জন্যে

একটা ঘর ছিল—তারা যতদিন ইচ্ছা থেকে খাওয়া দাওয়া করে নিজের গন্তব্যস্থানে চলে যেত।

চাকর আলো নিয়ে এল। তখন অতিথির চেহারাখানা দেখা গেল। মাথার উপর মস্ত একটা পাগড়ী, তার ল্যাজটা মুখের চারিদিকে এমনভাবে জড়ানো যে মুখের কোনো অংশই দেখা যায় না, শুধু চোখ দুটো যেখানে থাকা উচিৎ সেখান থেকে যেন একটা কালো আভা বেরুচ্ছে। সর্বাঙ্গে একটা কালো চাদর ঢাকা, নাগরা জুতো। লাঠিটা যে হাতে ধরে আছে সে হাতের কব্জি পর্যন্ত শুধু দেখা যাচ্ছে— আবলুশের মতো কালো! মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণে বড় ভয় হল। এই গ্রীষ্মকালে লোকটা আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে আছে কেন? মুখ দেখাচ্ছে না কেন? চোর ডাকাত নয় তো? মনে মনে সে এই কথা ভাবছে এমন সময় অতিথি খল্‌খল্ করে হেসে উঠল! হাসি শুনে মৃত্যুঞ্জয় চমকে উঠে বললে, 'তা বেশ, আজ রাত্তিরে এখানেই থাকুন—বসুন এসে। ওরে, হাত-মুখ ধোবার জল এনে দে।'

'দরকার নেই। আলোটা নিয়ে যেতে বলুন।'

চাকর আলো নিয়ে চলে গেলে অন্ধকারে লোকটা মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে এসে বসল; মৃত্যুঞ্জয়ের গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল, কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করে মুখে বললে, 'আপনার কোথা যাওয়া হবে?'

'পূবের দিকে যাচ্ছি।'

তারপর দুজনে আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। এই বৈশাখ মাসের গরমেও মৃত্যুঞ্জয়ের একটু গা শীত শীত করতে লাগল। হুঁকোয় বড় বড় গোটাকয়েক টান দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'তামাক ইচ্ছে করবেন কি? আনিয়ে দেব?'

আবার সেই খল্‌খল্ হাসি! আগন্তুক বললে, 'তামাক, বহুকাল খাইনি। কিন্তু থাক, এযাত্রা আর কাজ নেই।'

এতক্ষণে মৃত্যুঞ্জয়ের মনে পড়ল যে আগন্তুকের নাম জানা হয়নি ; সে বললে, 'মশায়ের নামটি কি ?'

অতিথি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, অন্ধকারে মনে হল যেন তার চোখ দিয়ে কালো আগুন বেরুচ্ছে, সে বললে, 'অত খবরে দরকার কি, যা বলেছি তাই যথেষ্ট, এখন আমি কোথায় শোব দেখিয়ে দাও, অনেক দূর থেকে এসেছি ক্লান্তি বোধ হচ্চে !'

অতিথির এই রূঢ় কথায় মৃত্যুঞ্জয়ের রাগও হল আবার ভয়ও হল। একবার ভাবলে, হয়ত কোনো রাজারাজড়া গোছের বড়লোক ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্চে, তাই পরিচয় দিতে চায় না, যা হোক, সে বললে, 'কিন্তু আহারাদি করবেন না ?'

'না, আমার পেটের ক্ষিদে তোমরা মেটাতে পারবে না। আবার যখন আসব তখন হবে।'

অতিথির কথার মানে মৃত্যুঞ্জয় কিছুই বুঝতে পারলে না, কিন্তু তবু বাড়ীতে অভুক্ত অতিথি থাকলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। তাই সে আবার বললে, 'কিন্তু, অনেক দূর থেকে আসছেন বললেন, ক্লান্তও হয়েছেন, একটু আহার করে শুলে হত না ?'

অতিথি বললে, 'না, কোথায় শোব দেখিয়ে দাও।'

মৃত্যুঞ্জয় তখন তাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দিলে। অতিথি ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো ; তারপর আর তার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

নানারকম দুর্ভাবনা মৃত্যুঞ্জয়ের মনে আনাগোনা করতে লাগল। লোকটা কে ? যদি ভাল লোকই হবে তবে অমন মুখ ঢাকা দিয়ে বেড়ায় কেন ? লোকটার গলার আওয়াজ কি ভয়ঙ্কর—শুনলেই গা কেঁপে ওঠে, আর গায়ের রঙ, কি কালো। শুধু একটা হাত দেখতে পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু সেটা যেন আলকাৎরার মত! যদি সত্যিই

ডাকাত কি বদমায়েস হয় তাহলে উপায়! মৃত্যুঞ্জয় বাড়ীর ভিতর গিয়ে চাকরবাকরকে সাবধান করে দিলে যেন তারা রাত্রে সতর্ক থাকে। আর নিজে ঠিক করলে ওই অজ্ঞাত অতিথির গতিবিধির উপর নজর রাখবে। মনে মনে এই সঙ্কল্প এঁটে সে রাত্রির মত খাওয়া দাওয়া শেষ করে আবার চণ্ডীমণ্ডপে এসে বসল। বাড়ীতে একটা পুরনো মরচেধরা তলোয়ার ছিল, সেইটে সঙ্গে রইল।

চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বিশ হাত দূরে অতিথির ঘর—সেখান থেকে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত আস্‌ছে না। এদিকে চণ্ডীমণ্ডপে বসে মৃত্যুঞ্জয় ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানছে আর মাঝে মাঝে চোখ টেনে অতিথির ঘরের দিকে চাইছে। ক্রমে রাত্রি বেড়ে চল্‌ল, গ্রাম একেবারে নিশুতি হয়ে গেল। কৃষ্ণপক্ষের আকাশের বড় বড় তারাগুলো দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলতে লাগল।

একবার মৃত্যুঞ্জয় পা টিপে টিপে উঠে অতিথির দরজায় আড়ি পেতে শোনবার চেষ্টা করলে অতিথি জেগে আছে কিনা। কিন্তু কোন শব্দই সে পেলনা—এমন কি অতিথির নাক ডাকার শব্দ পর্যন্ত নয়! তখন সে ফিরে এসে আবার তামাক সেজে টানতে লাগল। এমনি ভাবে রাত-দুপুর পার হয়ে গেল।

হুঁকো হাতে করেই মৃত্যুঞ্জয় ঝিমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কিসের শব্দে চট্‌কা ভেঙে চোখ চেয়ে দেখলে আকাশে হলুদ রঙের এক টুক্‌রো চাঁদ উঠেছে—তারই আলোতে বাইরের প্রকৃতি অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। শব্দটা কোন্ দিক থেকে এল সে ধরতে পারেনি, কান খাড়া করে রইল। কিছুক্ষণ বাদে খুট্ করে আবার শব্দ হল। যেন কে খুব সন্তর্পণে অতিথির ঘরের দরজা খুলছে। মৃত্যুঞ্জয় নিঃশব্দে হাতের হুঁকো নামিয়ে রেখে সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ আবার নিস্তব্ধ। তারপর অতিথির ঘরের দরজা দিয়ে

একটা মূর্তি বেরিয়ে এল ! 'চাঁদের আবছায়া আলোতে তার চেহারা দেখে মৃত্যুঞ্জয়ের বুকের স্পন্দন যেন হোঁচট্ খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েই আবার উন্মত্ত বেগে ছুট্‌তে আরম্ভ করল। সে দেখলে, মানুষ নয়, একটা আস্ত মানুষের কঙ্কাল উলঙ্গ হয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তার হাড়গুলো শাদা নয়—কুচ্ কুচে কালো। পাঁজরার ভিতর দিয়ে এপার ওপার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—আর হাতে সেই লম্বা লাঠিটা।

চণ্ডীমণ্ডপের অন্ধকারে বসে মৃত্যুঞ্জয় অষ্টমীর পাঁঠার মত কাঁপতে লাগল। কঙ্কালটা একবার ঘাড় বেঁকিয়ে সেই দিকে ফিরে দেখলে—তার মাংসহীন মুখে সারি সারি দাঁতগুলো চাঁদের আলোয় বিকট হাসির মত মনে হল। তারপর সে উঠান পার হয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

তার মূর্তিটা বাইরে মিলিয়ে যেতেই মৃত্যুঞ্জয় ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। চেঁচামেচি করে লোকজন জড় করবার ক্ষমতা ছিলনা, গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওই কঙ্কালটা কোথায় গেল জানবার অদম্য কৌতূহল তাকে পেয়ে বসল। ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে অথচ কঙ্কালের পিছন পিছন যাবার ইচ্ছা—এ এক আশ্চর্য মনের অবস্থা। বাঘের পিছু পিছু যখন কেউ ঘুরে বেড়ায় তখন তাদের মনের ভাবও বোধহয় ওই রকম হয়।

মৃত্যুঞ্জয় বেরিয়ে পড়ল। বাইরে এসে দেখলে কঙ্কালটা লাঠি কাঁধে করে অনেক দূরে এগিয়ে চলেছে। সেও সেইদিকে চলল। ক্রমে কঙ্কাল শ্মশান-ঘাটে গিয়ে পৌঁছল। মৃত্যুঞ্জয় তখন একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে তার কার্যকলাপ দেখতে লাগল।

শ্মশানে অনেক ভাঙা কলসী আর মড়ার হাড়গোড় পড়েছিল। চিতা জল দিয়ে নিভিয়ে দেবার পর যেমন সেখানে একটা লম্বা গর্ত হয়ে যায়, সেইরকম একটা জায়গায় কঙ্কালটা গিয়ে দাঁড়াল।

তারপর কাঁধ থেকে লাঠিটা নামিয়ে তার মুণ্ডটা সেই গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে লাঠির মুণ্ডটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। তখন পৈশাচিক অট্টহাসির মত একটা চিৎকার করে কঙ্কালটা সেই জ্বলন্ত লাঠি কাঁধে ফেলে দৌড়তে আরম্ভ করলে।

মৃত্যুঞ্জয়ও মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পিছনে ছুটতে লাগল। তখন তার আর বাহ্যজ্ঞান নেই, স্বপ্নে যেমন নিজের দেহ মনের উপর কোনো অধিকার থাকেনা তেমনি অসহায়ভাবে সে কঙ্কালকে অনুসরণ করে ছুটে চল্ল।

লাঠির আগাতে আগুন জ্বলছিল বটে, কিন্তু তা থেকে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই বেশী বার হচ্ছিল। মৃত্যুঞ্জয় দেখলে, ধোঁয়াটাও ঠিক যেন ধোঁয়া নয়, যেন রাশি রাশি কালো পোকা বেরিয়ে চারিদিকের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। যেন অগণ্য অসংখ্য মশা সেই আগুনে জন্মগ্রহণ করে আকাশ ছেয়ে ফেল্‌ছে।

শ্মশান থেকে বেরিয়ে রেলের বাঁধের উপর উঠে কঙ্কালটা ছুটতে লাগল আর এক অপার্থিব হাসি হাসতে লাগল। যেন সে হাসি অন্যান্য অশরীরী সঙ্গীদের ডেকে বল্‌ছে—আয় আয়, মানুষের রক্ত শুষে খাবি তো আয়! হা-হা! বড় মজা! শিগ্‌গির আয়! শিগ্‌গির আয়!

রেলের পাড়ের উপর উঠে মৃত্যুঞ্জয় দেখলে—তার বাড়ীর দিকটাতে যেন অনেক আলো জ্বলছে, সেদিকটা রাঙা হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে কথা ভাববার তার সময় ছিলনা, সে অন্ধভাবে কঙ্কালের পিছনে ছুটে চল্‌ল।

কঙ্কাল সমস্ত গ্রামটাকে একবার প্রদক্ষিণ করলে। তারপর মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীর কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীতে আগুন লেগেছে, সমস্ত বাড়ীখানা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

কঙ্কাল তার হাতের জ্বলন্ত লাঠিটা সেই আগুনের মধ্যে ফেলে দিলে। তারপর হঠাৎ ফিরে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের সামনে দাঁড়াল।

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণে আর তখন ভয় ছিলনা, সে কঙ্কালকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কে ?'

কঙ্কাল খল্‌খল্ করে হেসে বললে, 'কে আমি ? আমি অগ্রদূত, আমার সঙ্গীরা সব আসছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আসছে। বাংলাদেশ ছেয়ে যাবে—ঘরে ঘরে মড়াকান্না উঠবে, তারপর চিতায় দেবার লোকও থাকবেনা—ঘরে ঘরে পচা মড়া পড়ে থাকবে। রাস্তায় শেয়াল-কুকুর মড়া নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করবে। হাঃ হাঃ হাঃ! আসছে —তারা আসছে! আমি যাই—এগিয়ে চলি!' এই পর্যন্ত বলে কঙ্কাল যেন হঠাৎ হাওয়ায় মিশিয়ে গেল।

পূবদিক তখন ফর্সা হয়ে আসছে। মৃত্যুঞ্জয় সেইদিকে তাকিয়ে দেখলে, মনে হল যেন ধোঁয়ার মত প্রকাণ্ড একঝাঁক মশা সঙ্গে করে নিয়ে লম্বা পা ফেলে কঙ্কালটা পূবদিকে এগিয়ে চলেছে।

এতক্ষণ পরে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

গাঁয়ের লোক এসে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীর আগুন নেভাবার চেষ্টা করলে ; কিন্তু আগুন নেভানো গেলনা—বাড়ী একেবারে ছাই হয়ে গেল।

মূর্ছা ভেঙে উঠে মৃত্যুঞ্জয় পাগলের মত এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সব কথা বললে। তার গল্প শুনে গাঁয়ের লোকেরা মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। তারপর যে-যার বাড়ী ফিরে গিয়ে এই কথাটাই আলোচনা করতে লাগল যে কাল রাত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের আফিমের মাত্রা নিশ্চয় এক-মটর থেকে দু'মটরে উঠেছিল।

পিণ্টু

আমার একটা দু'নলা বন্দুক আছে। বারো বোরের বন্দুক, ব্রীচ্‌-লোডিং—অর্থাৎ গাদা বন্দুক নয়। দিশী মিস্ত্রী এই বন্দুক তৈরী করেছে—কিন্তু এত সুন্দর জিনিস যে বিলিতি বন্দুকের চেয়ে কোনো অংশে খারাপ নয়। দেড়শো গজ পর্যন্ত তার পাল্লা—পয়েণ্ট ব্ল্যাংক —এ দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁস মারা যায়, যদিও এটা হাঁস-মারা বন্দুক—ডাক গান—নয়। এই বন্দুকটি আমার বড় প্রিয়।

পাখী শিকার করতে আমি বড় ভালবাসতুম। শীতকালে যখন খালে বিলে নানা জাতের হাঁস পড়তে আরম্ভ করত তখন আমি বন্দুক কাঁধে করে বার হতুম। সে সময় আমার সঙ্গী থাকত কেবল আমার কুকুর—পিণ্টু। পিণ্টু খাঁটি দিশী কুকুর—তার গায়ে এক ফোঁটাও বিলিতি রক্ত ছিল্‌না, ইচ্ছে করলে তোমরা তাকে নেড়ি কুত্তাও বল্‌তে পার। তার চেহারাটি ছিলো রোগা, গায় শাদা-কালো ছাপ, মুখটি ছুঁচোলো, চোখে একটি লজ্জিত সঙ্কুচিত ভাব। সত্যি কথা বল্‌তে কি, পিণ্টু খুব সাহসী কুকুর ছিলনা ; ভিনপাড়া দিয়ে যাবার সময় তার ল্যাজটি অলক্ষিতে পিছনের পা দুটির ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করত, আর পাড়ার কুকুরগুলো যখন ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আস্‌ত তখন সে কেবলি আমার পাশে ঘেঁষে ঘেঁষে আসত, আর গলার মধ্যে 'গর্‌র্‌ গর্‌র্‌' শব্দ করত। দাদা বলতেন, শুধু দুধ-ভাত খেয়ে খেয়েই পিণ্টুর সব সাহস মিইয়ে গেছে। কিন্তু সে যাই হোক, পিণ্টুর একটি অসাধারণ গুণ ছিলো; সে খুব ভালো মরা পাখী উদ্ধার করতে পারত।

গুলি খেয়ে উড়ন্ত পাখী যেখানেই পড়ুক—জলে স্থলে কিম্বা পাঁকের মধ্যে—পিণ্টু ঠিক তাকে মুখে করে নিয়ে আসবে। ইংরিজিতে এই জাতের কুকুরকে বলে রিট্রিভার। একবার এক সাহেব পিণ্টুর আশ্চর্য গুণপনা দেখে হুশো টাকা দিয়ে আমার কাছ থেকে কিনে নিতে চেয়েছিল। আমি দিইনি।

যাহোক, শীতকাল এলেই আমরা হু'জনে শিকারে বার হতুম। এমন অনেকবার হয়েছে যে, পাখীর সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে বাড়ী থেকে অনেক দূর চলে গিয়েছি, হু'তিন দিন বাড়ী ফেরাই হলনা। আমার শিকারের সখ বাড়ীর সকলে জানতেন, তাই উদ্বিগ্ন হতেন না।

গত বছর শিকার করতে গিয়ে কি ব্যাপার হয়েছিল সেই কথাই আজ বলব।

খবর পেলুম, শহর থেকে মাইল কুড়ি দূরে যে জলা আছে তাতে বিস্তর হাঁস পড়েছে; হাঁসগুলো আশেপাশের ধানক্ষেতের ক্ষতি করছে। মন উৎসুক হয়ে উঠল। অঘ্রাণ মাস—বেশ শীত পড়েছে, একদিন সকালবেলা পিণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। অজ পাড়াগাঁয়ে গাড়ী যাবার রাস্তা নেই—যেতে হলে এক গরুর গাড়ী চড়ে যেতে হয়। আমরা পায়ে হেঁটেই গেলুম, কারণ গরুর গাড়ী চড়ে কাঁচা রাস্তার ওপর দিয়ে বিশ মাইল যাওয়ার চেয়ে হেঁটে যাওয়া ঢের বেশী স্বাস্থ্যকর। অন্তত হাড়গুলো আস্ত থাকে।

জলার নিকটবর্তী গ্রামে গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যা হয় হয়—পশ্চিম আকাশে একটুখানি সোনালি আলো ঝিলমিল করছে। দূর থেকেই অসংখ্য হাঁসের কলকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলুম। হাঁসের ডাক সকলের ভালো লাগে কিনা জানি না, কিন্তু আমার বড় মিষ্টি লাগে। দেহের ক্লান্তি সত্ত্বেও মনটা আনন্দে নেচে উঠল। পিণ্টুও আমাকে ঘিরে আনন্দে নাচতে লাগল আর ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল।

গ্রামে বেশীর ভাগই নিম্নশ্রেণীর লোকের বাস কিন্তু একটি ছোট্ট পোষ্ট অফিস্ ছিলো। তারই পোষ্টমাষ্টারের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করলুম। তিনি ভারি ভদ্রলোক—গরম চা এবং প্রচুর জলখাবার দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। গরম গরম খাদ্যদ্রব্য পেটে পড়তেই শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল।

নানারকম কথাবার্তায় ক্রমে রাত্রি হয়ে গেল, পূবের আকাশ উদ্ভাসিত করে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। আমি তখন পোষ্টমাষ্টারবাবুকে বললুম, 'এবার বেরুনো যাক। কোন্ দিক দিয়ে গেলে সহজে জলায় পৌঁছনো যাবে আমাকে দেখিয়ে দিন।'

আমার কাঁধে বন্দুক দেখেই পোষ্টমাষ্টার বুঝেছিলেন যে আমি শিকার করতে এসেছি কিন্তু আমি সে রাত্রেই পাখী মারতে বেরুব তা তিনি বুঝতে পারেন নি। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'রাত্তিরে পাখী মারতে যাবেন?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ—রাত্তিরেই তো পাখী মারবার সুবিধা, দেখচেন না কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে।'

পোষ্টমাষ্টার একটু ভয়ে-ভয়ে বললেন, 'কিন্তু রাত্তিরে জলার দিকে যাবেন? সন্ধ্যার পর ওদিকে কেউ যায় না।'

'সেকি! কেন?'

তিনি কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'কি জানি মশায়, আমি চোখে কিছু দেখিনি। শুনতে পাই জলায় নাকি অপদেবতা আছেন।'

আমি হেসে উঠলুম, 'অপদেবতা! সে আবার কি?'

তিনি বললেন, 'তা জানিনে মশাই, তবে শুনেছি শরবনের মধ্যে নাকি পেত্নী আছে।'

আমি হাসতে লাগলুম, বললুম, 'তা থাক পেত্নী। আমার হাতে বন্দুক আছে দেখলে সে নিজেই ভয়ে পালিয়ে যাবে।'

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'যাওয়া বোধহয় উচিত নয়। একবার এক সাহেব আপনারই মত রাত্তিরে জলায় শিকার করতে গিয়েছিল, সে আর ফিরে আসেনি।'

আমি বললুম, 'কোনো ভয় নেই—আমি এগারোটার মধ্যেই ফিরে আসব। আপনি শুধু আমায় পথটা দেখিয়ে দিন।'

তিনি তখন অনিচ্ছাভরে গাঁয়ের সীমানা পর্যন্ত এসে আমায় জলা দেখিয়ে দিলেন। জলাটা সেখান থেকে মাইলখানেক দূরে—চাঁদের আলো তার ওপর ঝক্ ঝক্ করছে আর ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট পাখীর সারি তার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

চাঁদনী রাতে জলার ধারে কি করে পাখী শিকার করতে হয় তা বোধহয় সকলে জানে না; অথচ ব্যাপারটা খুব সহজ—এমন কি দিনের বেলা পাখী শিকার করার চেয়েও সহজ। রাত্রে জলার পাখীরা চোখে ভাল দেখতে পায় না কিন্তু কেবলই উড়ে বেড়ায়—জলার এধার থেকে ওধারে যায় আবার এধারে ফিরে আসে। তাই, চাঁদ যখন গাছের ডগা ছাড়িয়ে ওঠে তখন সেই চাঁদের দিকে লক্ষ্য রেখে বন্দুকে টোটা ভরে কোন ঝোপের আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পাখীর সার যখন চাঁদের কাছ দিয়ে উড়ে যায় তখন চাঁদ লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়তে হয়। ছর্‌রা খেয়ে পাখীগুলো ধপ্ ধপ্ করে মাটিতে পড়ে। তখন কুকুর গিয়ে সেগুলোকে খুঁজে নিয়ে আসে। এ রকম শিকারের সুবিধা এই যে পাখীর পিছন পিছন ঘুরে বেড়াতে হয় না, এক জায়গায় দাঁড়িয়েই অনেক পাখী পাওয়া যায়।

যাহোক আমি আর পিণ্টু আলের ওপর দিয়ে জলার দিকে চললুম। বেশ একটু ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। কিন্তু আমার গায়ে গরম কোট হাফ্ প্যাণ্ট্ ছিলো, পায়ে হোস্ আর বুটজুতো ছিলো, তাই ঠাণ্ডা হাওয়া ভালই লাগল।

ক্রমে জলার কাছে এসে পড়লুম। এখানকার মাটি নরম, মাঝে মাঝে জল সরে গিয়ে আধ-শুকনো পাঁকও রয়েছে। জলাটা প্রকাণ্ড —একটা হ্রদ বললেও চলে; কিন্তু জল খুব গভীর নয়। তার কিনারা ঘিরে ঘন শরবন জন্মেছে, মাঝখানেও স্থানে স্থানে শরের গোছা উঁচু হয়ে আছে। চাঁদের আলোয় সমস্ত দৃশ্যটা এমন অস্পষ্ট হয়ে আছে—যেন পৃথিবীর আদিম যুগের তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রকৃতির চিত্র। দেখলে প্রাণের ভিতরটা কেমন করে ওঠে।

জলের কিনারা পর্যন্ত যাবার কোনো দরকার ছিলনা, চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম কতকগুলো কাঁটাগাছের শুক্‌নো ঝোপ ইতস্ততঃ ছড়ান রয়েছে। তারই মধ্যে একটা বেছে নিয়ে আমি তার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালুম। বন্দুকে টোটা ভরে পাখীর জন্যে তৈরী হয়ে রইলুম।

এইবার পিণ্টুর চাল-চলন লক্ষ্য করলুম। সে এতক্ষণ বেশ লাফালাফি করতে করতে আমার সঙ্গে আসছিল কিন্তু এখানে এসেই কেমন যেন জড়সড় হয়ে গেল। তার ল্যাজটি করুণভাবে পায়ের মধ্যে প্রবেশ করল, সে শঙ্কিত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে একটা ক্ষীণ কুঁই কুঁই শব্দ করতে লাগল।

চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, অন্য কোনো কুকুর বা ভয়াবহ কিছুই নেই। ভাবলুম, জলার ধারে ঠাণ্ডা হাওয়ায় নিশ্চয় তার শীত করছে, তাই অমন করছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চম্‌কে উঠলুম। জলার কিনারা দিয়ে একটা খট্‌-খট্‌ খট্‌-খট্‌ শব্দ ক্রমশ আমার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে—যেন একটা বিকট হাসির আওয়াজ! কিন্তু তখনি বুঝতে পারলুম যে অস্বাভাবিক কিছু নয়, শরবনের মধ্যে দিয়ে হাওয়া বইছে। এই খট্‌-খট্‌ শব্দ ক্রমে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল, দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল, কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাসের মত

একটা শব্দ তখনো শরবনের ভিতর থেকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। আমার ভারি হাসি পেলো—এইসব শব্দ শুনেই বোধহয় গাঁয়ের লোকেরা ভূত-পেত্নীর ভয়ে এদিকে আসেনা।

আবার শব্দ! এবারের শব্দ এমনি অপার্থিব যে শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বহুদূর জলার বুক থেকে একটা দীর্ঘ কান্নার সুর, যেন কোনো স্ত্রীলোক কেঁদে উঠল—'আহা—হা—হা-হা'—চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলে এই কান্না ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেল।

জলাতে অনেক রকম অজানা পাখী থাকে, মনে হল হয়ত তাদেরই কেউ অমন করে কেঁদে উঠল। কিন্তু আমি অনেক পাখী মেরেছি, অনেক ঝিল্লে জঙ্গলে বেড়িয়েছি, এরকম পাখীর ডাক কখনো শুনিনি। পিণ্টুর দিকে তাকিয়ে দেখি, সে আমার পা ঘেঁষে এসে বসেছে আর তার শরীর থরথর করে কাঁপছে। আমি তার পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে বললুম, 'কিছু ভয় নেই পিণ্টু—ও পাখীর ডাক।'

পিণ্টু করুণভাবে আমার দিকে তাকাল, তারপর ছুটে গাঁয়ের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে ব্যগ্র-চোখে আমার পানে চেয়ে রইল। কুকুর কথা কইতে পারেনা, কিন্তু পিণ্টু যেন পরিষ্কার আমাকে বললে—'ফিরে চল, এ বড় খারাপ জায়গা, এখানে থেকে কাজ নেই।'

হায়! পিণ্টুর কথা যদি শুনতুম!

হাত-ঘড়িতে দেখলুম, সাড়ে নটা বেজেছে! এই সময় আকাশের শন্-শন্ শব্দে মুখ তুলে দেখি এক ঝাঁক পাখী—বোধ হয় মোরগাবি। কারণ মোরগাবিরা এত জোরে ওড়ে যে তাদের ডানার সাঁই-সাঁই আওয়াজ হয়—চাঁদের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলে ফায়ার করলুম—চারিদিকে একটা বিকট প্রতিধ্বনি উঠল। তারপরে ধপ্ করে একটা শব্দ হল। বুঝলুম পাখী পড়েছে।

পাখী পড়ার শব্দে পিণ্টুর ভয় কেটে গেল। সে কান খাড়া করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর লাফাতে লাফাতে যেদিকে পাখী পড়েছিল সেইদিকে ছুটল।

পাখীটা পঞ্চাশ হাত দূরে একটা ঝোপের মধ্যে পড়েছিল, পিণ্টু সেই ঝোপের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর চোঁ-চোঁ করে পালিয়ে এসে আমার জুতোর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে পড়ল। আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কি হয়েছে পিণ্টু ? পালিয়ে এলি যে ?' তার গায়ে হাত দিয়ে দেখি তার ঘাড়ের রোঁয়া কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠেছে।

পিণ্টু কখনও এ রকম করে না, তাই ভারি আশ্চর্য হয়ে আমি নিজেই সেই ঝোপটার দিকে অগ্রসর হলুম। কাঁটাগাছের ঝোপে পাতা নেই, তার ভিতরে পরিষ্কার চাঁদের আলো পড়েছে। ঝোপের দশ হাতের মধ্যে গিয়ে আমিও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দেখলুম মরা পাখীটা মাটিতে পড়ে রয়েছে, আর শাদা কাপড় পরা একটা স্ত্রীলোকের মূর্তি তার উপর ঝুঁকে পড়ে যেন তাকে আগলে রয়েছে।

এই সময় আবার সেই তীব্র কাতরোক্তি ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল—'আহা—হা—হা—হা—'

ভয়ের একটা শিহরণ আমার হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। কে ও ? মানুষ না আর কিছু ? অমন করে কেঁদে উঠল কেন ?

প্রাণপণে ভয় দমন করে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে ?'

আবার সেই বুক-ফাটা কান্না—'আহা—হা—হা—হা—'

আমি জড়মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলুম ; ইচ্ছে হল পালাই, কিন্তু পালাতে পারলুম না। আমার দুই চোখ সেই ঝোপের মধ্যে নারী মূর্তির ওপর নিবদ্ধ হয়ে রইল।

হঠাৎ নারীমূর্তি উঠে দাঁড়াল, ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

আমি তার মুখ দেখতে পেলুম না, সর্বাঙ্গ কুয়াশার মত শাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। সে একটা শাদা হাত তুলে আমায় ডাকলে, তারপর নিঃশব্দে চলে যেতে লাগল।

খানিক দূর গিয়ে সে ফিরে দাঁড়াল, তারপর আবার হাত তুলে আমায় ডাকলে। আমার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি যেন একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কলের পুতুলের মত আমি তার পিছন পিছন চললুম।

পিণ্টু এতক্ষণ অনেক দূরে পিছিয়ে ছিলো, এবার সে ছুটে এসে আমার পা কামড়ে ধরলে। ভয়ে তার গা কাঁপছে, শরীর যেন কুঁক্‌ড়ে ছোট হয়ে গেছে, তবু সে আমায় ফেলে পালাতে পারছে না। আমার পা কাম্‌ড়ে ধরে পিছন দিকে টানতে লাগল, যেন কিছুতেই আমাকে যেতে দেবে না।

কিন্তু চুম্বকের আকর্ষণ লোহাকে যেমন টেনে নিয়ে যায় আমিও তেমনি অন্ধভাবে সেই মূর্তির অনুসরণ করলুম। পিণ্টু পদে পদে বাধা দিতে লাগল, পায়ের কাছে পড়ে কেঁউ কেঁউ করে মিনতি জানাতে লাগল, তবুও আমার গতিরোধ করতে পারল না।

ক্রমে তল্‌তলে নরম পাঁকের ওপর এসে পড়লুম। সে যে কি ভয়ঙ্কর জিনিস তা বর্ণনা করা যায়না। আর এই পাঁকে আস্তে আস্তে ডুবে মরার মত ভয়াবহ মৃত্যুও কল্পনা করা কঠিন। আমি কিন্তু কোথায় যাচ্ছি কিছুই জ্ঞান ছিলনা, কেবল সেই মূর্তির দিকে চোখ রেখে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। ক্রমে যখন পাঁকের মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যেতে লাগল তখন দাঁড়িয়ে পড়লুম। মূর্তিও সামনে খানিক দূরে দাঁড়াল। তারপর আবার সেই রক্ত-জল-করা আওয়াজ— 'আহা—হা—হা—হা'। এবার কিন্তু কান্না নয়, মনে হল যেন সে একটা পৈশাচিক প্রতিহিংসার হাসি হাসছে।

আমি আর এগিয়ে যাচ্ছিনা দেখে মূর্তি দু'এক পা ফিরে এল,

খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আবার আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লে। ওদিকে আর বেশী এগোলে এই অতল পাঁকের মধ্যেই ডুবে যাব বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু তবু ঐ হাতছানি অমান্য করবার সাধ্য নেই। বন্দুকটা এতক্ষণ হাতেই ছিল, এবার ফেলে দিলুম। তারপর পাগলের মত সেই পাঁকের ভিতর দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চললুম।

পিণ্টু! এই সময় পিণ্টু যে অদ্ভুত কাজ করলে তা জীবনে কখনো ভুলবনা। সে এতক্ষণ আমার পিছন পিছন আসছিল, কিন্তু যখন দেখলে যে আমি উরু পর্যন্ত কাদায় ডুবে যাচ্চি তখন সে হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার করে আমার সামনে এল। আমি দেখলুম, তার সর্বাঙ্গের রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠেছে আর সে হিংস্র ভাবে দাঁত বার করে সেই মূর্তির পানে ছুটে চলছে।

শাদা মূর্তিটার সামনে পৌঁছে সে কণ্ঠ লক্ষ্য করে তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত কম্পিত চীৎকার পিণ্টুর কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল। যাকে লক্ষ্য করে সে লাফ দিয়েছিল সেই মূর্তি হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল; পিণ্টু কোথাও বাধা না পেয়ে কাদায় পড়ে গেল। আর উঠল না।

'পিণ্টু! পিণ্টু!'—আমি আত্মহারার মত ছুটে গেলুম যেখানে পিণ্টু পড়ে ছিল। সেখানে পাঁক তত গভীর নয়, তলায় শক্ত মাটি আছে। পিণ্টুর নিশ্চল দেহ দু'হাতে তুলে নিয়ে দেখলুম তার দেহে প্রাণ নেই—সে মরে গিয়েছে। সেই যে ভয়ার্ত চীৎকার—তারই সঙ্গে সঙ্গে পিণ্টুর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছে।

চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, সেই শাদা মূর্তি কোথাও নেই—যেন জলাভূমিতেই মিলিয়ে গিয়েছে।

'পিণ্টু! পিণ্টু!' বলে তার কাদা-মাখা শরীর বুকে জড়িয়ে নিয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে জ্ঞান হল। তখনো পিণ্টুর মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে আছি।

সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা আর ১০৫ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে একলা বাড়ী ফিরে এলুম।

ক্রমে সেরে উঠলুম। এখনও মাঝে মাঝে শিকারে যাই, কিন্তু আমার পিণ্টু নেই, শিকারে মন লাগে না।

যখন মনে হয় পিণ্টু আমার প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়েছে—দারুণ ভয়ে তার বুকের স্পন্দন থেমে গেছে, কিন্তু তবু ভালবাসা একতিল কমেনি—তখন কান্নায় বুক ভরে ওঠে।

পিণ্টু সাহসী কুকুর ছিল না ; কিন্তু দরকারের সময় তার মতন সাহস ক'জন দেখাতে পেরেছে ?

স্বামী চপেটানন্দ

নেপালচন্দ্র—ওরফে জেনারেল ন্যাপলার সঙ্গে বোধ হয় তোমাদের পরিচয় আছে। একবার সে বুদ্ধি খাটিয়ে মিশন স্কুলের গুণ্ডা ছেলেদের কেমন জব্দ করেছিল, সে গল্প হয়ত পড়ে থাকবে।

নেপাল ছেলেটি দেখতে রোগা পট্‌কা বটে, আর বয়সও খুব কম, —কিন্তু তার মাথায় এতরকম বুদ্ধি আসে যে, কেউ তাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। বাংলার মাস্টার বলাইবাবু তার মাথায় গাঁট্টা মেরে ভারি বিপদে পড়েছিলেন, সেই থেকে কোনও মাস্টার তার গায়ে হাত তুলতেন না।

নেপাল পড়াশোনায় ভালই ছিল। কিন্তু তবু পরীক্ষার সময় কার না ভয় হয়? বিশেষতঃ বলাইবাবু ওৎ পেতে আছেন, একটু স্থবিধা পেলেই তাকে ফেল করিয়ে দেবেন।

বলাইবাবুর ভয়ে নেপাল ভীষণ মনোযোগ দিয়ে বাংলা পড়ছে; কিন্তু তবু প্রাণে শান্তি নেই—কী জানি কি হয়!

সেদিন বাংলার পরীক্ষা। ভোরবেলা উঠেই নেপাল সজোরে পড়া মুখস্থ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে, এমন সময় তার বন্ধু স্থধা এসে হাজির।

স্থধা বললে, 'কি রে, আজও পড়া মুখস্থ করছিস?'

নেপাল বললে, 'হ্যাঁ ভাই, আজ যে বাংলা পরীক্ষা।'

স্থধা বললে, 'বাংলা পরীক্ষায় এত ভয় কিসের? তারচেয়ে চল্, কালীতলায় একটা নতুন সাধু এসেছেন, তাঁকে দেখে আসি।'

সাধু দেখবার মত মনের অবস্থা নেপালের ছিল না, সে বললে, 'না ভাই, আজ বলাইবাবু এগজামিনার, আজ যদি একটা ভুল করি তাহলে আর রক্ষে থাকবে না।'

সুধার নিজের সাধু দেখবার খুব ইচ্ছা, অথচ একলা যেতেও কেমন বাধো-বাধো ঠেকে। তাই সে সাধুর বর্ণনা আরম্ভ করলে; বললে, 'কিন্তু আশ্চর্য সাধু, ভাই! তাঁর নাম স্বামী চপেটানন্দ, ভক্তেরা তাঁকে 'চড়ুবাবাজী' বলে ডাকে। তিনি নাকি যাকে একটি চড় মারেন তার কার্যসিদ্ধি হবেই।'

নেপাল অবাক হয়ে বললে, 'যাঃ! তা কখনো হয়?'

সুধা বললে, 'হ্যাঁ রে, তাঁর চড়ের নাকি অদ্ভুত গুণ। সমরেশদার ছোট ভাই ক্যাবলার ইয়া বড় পিলে হয়েছিল; চড়ুবাবাজী তাকে একটি চড় মারলেন—ব্যস্, পিলে অমনি ভাল হয়ে গেছে!'

'অ্যাঁ! বলিস কী?'

'হ্যাঁ। ভয়ঙ্কর ভাল সাধু—যে যা মানস করে যায়, তার তা সিদ্ধ হবেই। স্বামীজীর চড়ের এমনি মহিমা!'

নেপালের মাথায় অমনি বুদ্ধি গজালো। সে ভাবতে-ভাবতে বললে, 'আচ্ছা—মনে কর, তিনি যদি আমাকে একটা চড় মারেন তাহলে আমি পরীক্ষায় পাশ করতে পারব?'

সুধা ভারি উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'নিশ্চয় পারবি। বলাইবাবু তোকে কিছুতেই ফেল করাতে পারবেন না। তাই চল্ নেপাল, চড়ুবাবাজীর কাছে একটা চড় খেয়ে আসবি—ব্যস্, কেল্লা ফতে! পড়তেও হবে না কিছুই, ড্যাং-ড্যাং করে পাশ হয়ে যাবি। আমিও চড় খাব, যা থাকে বরাতে। হিস্ট্রিটা ভাল লিখতে পারিনি—তারিখগুলো আমার একদম মনে থাকে না। চল্, আর দেরি নয়।'

নেপাল আর লোভ সামলাতে পারলে না। বেরিয়ে পড়ল।

গঙ্গার ধারে কালীতলা। সেখানে প্রকাণ্ড অশথ্ গাছের নীচে বাঘের চামড়ার উপর চপেটানন্দ স্বামী বসে আছেন। তখনও ভক্তেরা কেউ এসে জোটেনি।

সুধা আর নেপাল ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলে। বাবাজীর চেহারাটি চিম্‌ড়ে, মুখে অনেক দাঁড়ি-গোঁফ আছে ; চোখ ছুটি করমচার মত লাল। তাঁকে দেখে ভারি তিরিক্কি মেজাজের লোক বলে মনে হয়। তিনি আবার কথা কন না। সব সময় মৌনী হয়ে থাকেন। সুধা আর নেপালকে তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন।

চড়ুবাবাজীর রুক্ষ চেহারা দেখে নেপালের খুব ভরসা হল ; সে ভাবল—নিশ্চয় ইনি খুব তেজী সন্ন্যাসী ! এঁর চড় কখনও বিফল হবে না। হাতজোড় করে সে বললে, 'চড়ুবাবা, আজ আমার বাংলার পরীক্ষা। প্রিপারেশন ভালই করেছি, তবু ভয় হচ্ছে বলাইবাবু আমাকে গোল্লা খাওয়াবেন। তাই আপনার কাছে এসেছি, আপনি যদি দয়া করে আমাকে একটি চড় মারেন তো বড় ভাল হয়।'

'বেশী জোরে মারবেন না প্রভু, আস্তে মারলেই কাজ হবে—'

কিন্তু চড়ুমহারাজা তা শুনবেন কেন ! তিনি নেপালের গালে একটি বিরাশি শিক্কা ওজনের চড় কষিয়ে দিলেন। নেপাল একে ছুর্বল, তার উপর হঠাৎ এত বড় চড় আশাই করে নি ; সে একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। চপেটানন্দ স্বামী চড় মেরেই আবার গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

গালে হাত বুলোতে-বুলোতে নেপাল উঠে বসল। তার মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবু কাউকে কিছু বলবার নেই, সে নিজেই তো চড় খেতে চেয়েছে। সুধা তার হাত ধরে টানতে টানতে বললে, 'আয় নেপাল, তোর কাজ হয়ে গেছে। এবার নিশ্চয় পাশ করবি।'

সুধা নিজে আর চড় খেলে না। বাবাজীর চড়ের বহর দেখেই তার পিলে চমকে গিয়েছিল। সে মনে-মনে ভাবলে—কী হবে চড় খেয়ে? হিস্ট্রি পরীক্ষা তো হয়েই গেছে—এখন চড় খেলে হয়ত কোনও ফলই হবে না, তারচেয়ে নেপাল চড় খেয়েছে এই ভাল হয়েছে।

* * * *

ভাল কিন্তু মোটেই হয়নি। নেপাল সেদিন বাংলা পরীক্ষা দিলে বটে, কিন্তু চড় খেয়ে তার মাথা ঘুলিয়ে গিয়েছিল বলেই হোক, অথবা যে-কারণেই হোক, বেচারা পাশ করতে পারলে না। বলাইবাবু তাকে অনেক গোল্লা দিলেন।

এদিকে; কী করে জানি না, স্বামী চপেটানন্দের কাছে চড় খাওয়ার খবরটা ক্রমে স্কুলে রাষ্ট্র হয়ে গেল। সবাই নেপালকে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করলে। কেউ বললে—কি রে, চড় খেলি তবু পাশ করতে পারলি না! কেউ বললে—আর একটা চড় খেয়ে আয়, তাহলে তোর মাথায় বুদ্ধি গজাবে। গিরীন বললে, 'ন্যাপলা, আমি একটা হনুমান পুষেছি, তুই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, তাহলে তোর বুদ্ধি বাড়বে।'

এতদিন বুদ্ধির জন্য সবাই নেপালকে মনে-মনে ভয় করত; তাই এখন বোকা বলবার সুযোগ পেয়ে সকলেই মনের আনন্দে তাকে ক্ষেপাতে শুরু করলে।

নেপালের মনের অবস্থা সহজেই বোঝা যায়; সে ভারি মুষড়ে পড়ল। চড়বাবাজী যে একটা ভণ্ড-সন্ন্যাসী তাতে আর সন্দেহ রইল না। যদি সত্যিকার সাধুই হবে, তবে সে ফেল করলে কেন?

কয়েকদিন কেটে গেল। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধার সঙ্গে খেলার মাঠে নেপালের দেখা হল। নেপাল মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল, সুধা অনেক খোসামোদ করে তার সঙ্গে ভাব করলে। নেপাল বললে, 'তুই-ই যত নষ্টের গোড়া!'

অনুতপ্ত সুধা বলল, 'আমি তো তাই জানতুম না! তা—এখন আর রাগ করে লাভ কী বল? যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তারচেয়ে আয়, ঐ ভণ্ড-বাবাজীটাকে জব্দ করি।'

চড়ুবাবাজীকে জব্দ করবার মতলব নেপালের মাথায় ক'দিন থেকেই ঘুরছিল, কিন্তু সে কোনও উপায় ঠিক করতে পারছিল না। দুই বন্ধুতে এখন মাঠে বসে অনেক পরামর্শ করলে। কিন্তু একটিও মনের মতন ফন্দি মাথায় এল না। নেপাল তখন বুকে ঘাড় গুঁজে ভাবতে শুরু করলে।

আধঘণ্টা পরে সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে, 'হয়েছে, এবার বাবাজীকে চড় মারার মজা টের পাইয়ে দেব, হুঁ হুঁ—মহাবীর!'

সুধা আশ্চর্য হয়ে বললে, 'মহাবীর কী?'

নেপাল বললে, 'গিরীনদার মহাবীর। এখন চল, কাল সকালে সব ঠিক হবে। গিরীনদাকেও দলে নিতে হবে।'

* * * *

পরদিন সকালবেলা স্বামী চপেটানন্দ তাঁর বাঘের চামড়ার উপর শুয়ে ছিলেন আর দু'জন ভক্ত তাঁর পা টিপে দিচ্ছিল। এমন সময় গিরীন, সুধা আর নেপাল গুটি-গুটি সেখানে গিয়ে উপস্থিত। গিরীনের কোলে একটি সাত-আট বছরের ছেলে কিংবা মেয়ে—আগাগোড়া র‍্যাপারে ঢাকা। দেখে মনে হয়, বুঝি তার ভারি অসুখ করেছে, তাই তাকে চড়ুবাবাজীর চড় খাওয়ার জন্য আনা হয়েছে। এরকম রোগী বাবাজীর কাছে রোজ দু-চারজন আসে।

তিনজন স্বামীজীকে দণ্ডবৎ করলে। একজন ভক্ত গিরীনের কোলের র‍্যাপার-ঢাকা মূর্তিটি দেখিয়ে বললে, 'ওর কী হয়েছে?'

নেপাল বিনীত স্বরে বললে, 'ওর বড় অসুখ; তাই বাবাজীর কাছে নিয়ে এসেছি। উনি যদি দয়া করে ওকে ভাল করে দেন।'

ভক্ত বললে, 'তা ভাল করে দেবে। ওর কী রোগ হয়েছে?'

নেপাল বললে, 'তা তো জানি না; কিন্তু ও কথা বলতে পারে না। এখন বাবাজী যদি ওর মুখে কথা ফুটিয়ে দেন তো বড় ভাল হয়। আমরা পাঁচটাকা মানত করেছি। বাবাজীর পায়ে প্রণামী দেব, যদি একে ভাল করে দিতে পারেন।'

প্রণামীর কথা শুনে চপেটানন্দ উঠে বসলেন। ভক্ত বললেন, 'এই! এ আর বেশী কথা কী? প্রভু চড় মেরে মেরে অনেক বড় বড় রোগ ভাল করেছেন। ওকে কাছে নিয়ে এস।'

'কিন্তু ও বড় রাগী—আর, কিছুতেই মুখ খুলতে চায় না।'

ভক্ত বললে, 'তাতে ক্ষতি নেই। বাবার চড় খেলেই সব রোগ সেরে যাবে।'

'কথা কইতে পারবে তো?'

'খুব পারবে। দু'দিনের মধ্যেই মুখে খৈ ফুটবে।'

গিরীন তখন কোলের রোগীটিকে নিয়ে এগিয়ে গেল। আর চপেটানন্দ স্বামী মারলেন তার গাল লক্ষ্য করে এক প্রকাণ্ড চড়।

অমনি হুলুস্থূল কাণ্ড!

চড় খেয়ে র‍্যাপারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল—রোগী নয়, প্রকাণ্ড একটা গোদা হনুমান। সে হচ্ছে গিরীনের পোষা হনুমান, তার নাম মহাবীর। মহাবীর ভয়ানক রাগী, গিরীন ছাড়া আর কারুর শাসন মানে না। সে একেবারে চড়ুবাবাজীর ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল। ভক্ত দু'জন 'বাবাগো' বলে টেনে দৌড় মারলে।

চড়ুবাবাজীর সঙ্গে মহাবীরের রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। মহাবীরের গায়ে ভীষণ জোর, সে বাবাজীর ঘাড়ে এক কামড় বসিয়ে দিলে। বাবাজীর আর মৌনব্রত রইল না, তিনি 'খেলে রে! গেলুম রে! বাবা রে!' বলে চীৎকার করতে লাগলেন।

মহাবীর কিন্তু ছাড়ে না। সে একে হনুমান, তার উপর চড় খেয়ে বেজায় চটে গিয়েছিল। চিমড়ে চড়ু মহারাজ তাকে সামলাবেন কী করে! সে আঁচড়ে কামড়ে দাড়ি গোঁফ ছিঁড়ে—বাবাজীর অবস্থা শোচনীয় করে তুললে।

নেপাল, গিরীন আর সুধা দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। আরও অনেক লোক জুটে গেল। নেপাল মাঝে মাঝে বলতে লাগল, 'প্রভু, মহাবীরের মুখে কথা ফোটাতে পারলেন না!'

প্রভুর তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছে। তিনি আর কী করেন, শেষে দৌড় দিয়ে গঙ্গায় লাফিয়ে পড়লেন। মহাবীর তীরে দাঁড়িয়ে তাঁকে মুখ ভ্যাংচাতে লাগল।

চপেটানন্দ স্বামী সেই যে সাঁতার কেটে গঙ্গা পার হয়ে পালালেন, আর ফিরে এলেন না। তিনি যে সত্যিকার সাধু নন, একজন ভণ্ড তপস্বী, তা সহরের লোকও ক্রমে বুঝতে পারলে। কারণ দেখা গেল, তিনি যাদের চড় মেরেছিলেন তারা কেউ সিদ্ধিলাভ করেনি।

ফেল হওয়ার দুঃখ নেপালের একেবারে যায়নি বটে, কিন্তু সে যে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে এই আনন্দেই বিভোর হয়ে আছে। ইস্কুলে ছেলেরা আর তাকে কেউ ঠাট্টা করে না।

মোক্তার ভূত

শিবু-মোক্তার আর বেণী-মোক্তারকে মহকুমার সকলেই চিন্‌ত, তাদের মত ধূর্ত ধড়িবাজ লোক ও-তল্লাটে আর ছিল না। লোকে যেমন তাদের চিন্‌ত তেমনি ভয়ও করত। একবার তাদের পাল্লায় পড়লে আর কারুর রক্ষে ছিল না—জোঁক যেমন গা থেকে রক্ত শুষে নেয় অথচ জানতে পারা যায় না, তারাও তেমনি মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে টাকা শুষে শুষে মক্কেলকে সর্বস্বান্ত করে দিত।

আদালতে দু'জনের মধ্যে রেষারেষি চলত, আবার বাইরে ভাবও ছিল। কিন্তু শিবু মক্কেলকে বলত, 'বেণীটা জানে কি? ওকে এক তুড়িতে উড়িয়ে দেব।' আবার বেণীও নিজের মক্কেলকে বলত, 'শিবুটা একটা আস্ত গাধা—আইনের প্যাঁচে ফেলে ওর দফা রফা করব।'—কিন্তু সন্ধ্যেবেলা একজন আর একজনের দাওয়ায় বসে তামাক না খেলে রাত্রে ঘুম হত না।

এমনিভাবে দুই মোক্তার সারাজীবন পরস্পরের সঙ্গে বাইরে বন্ধুত্ব আর ভিতরে শত্রুতা করে ক্রমে বুড়ো হয়ে এলো। দু'জনেরই বেশ টাকাকড়ি বাড়ী ঘর হয়েছে—বলতে গেলে তারাই দেশের মধ্যে সবচেয়ে গণ্যমান্য হয়ে উঠেছে। বারোয়ারী দুর্গাপূজায় এক বছর শিবু প্রেসিডেণ্ট হয়, পরের বছর বেণী প্রেসিডেণ্ট হয়—স্কুল-কমিটিতেও তাই। কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়।

ওদের দু'জনের মধ্যে বোধ হয় শিবুরই ফিচ্‌লে বুদ্ধি বেশী ছিল। সে একদিন মনে মনে মৎলব আঁট্‌লে—বেণীকে ভাল করে ঠকাতে

পারেনি, বুদ্ধির যুদ্ধে কখনো বেণী জিতেছে কখনো শিবু জিতেছে। ফলে কেউই বড়াই করে বলতে পারত না যে, আমি বেশী চালাক।

শিবু-মোক্তার ফন্দি ঠিক করে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা হন্তদন্ত হয়ে বেণীকে গিয়ে বললে, 'ভাই বেণী, বড় বিপদে পড়েছি, পঞ্চাশটা টাকা ধার দিতে পার, কালই ফেরৎ পাবে।'

বেণী শিবুর মৎলব বুঝতে পারলে না, বললে, 'তার আর কি। নিয়ে যাও।'

শিবু টাকা নিয়ে নিজের বাড়ীতে গ্যাঁট্ হয়ে বসল। পরদিন টাকা ফেরৎ দেবার কথা, কিন্তু শিবুর দেখা নেই। বেণীর মন উতলা হয়ে উঠল। তারপর আরো ছ'দিন কেটে গেল, কিন্তু শিবুর টাকা দেবার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না।

বেণী মহা ফাঁপরে পড়ল। সে বুঝলে শিবু তাকে বিষম ঠকিয়েছে—কিন্তু লজ্জায় সেকথা কারুর কাছে বলতে পারলে না। হ্যাণ্ডনোটে না লিখিয়ে নিয়ে শিবুকে সে টাকা ধার দিয়েছে একথা জানাজানি হলে দেশসুদ্ধ লোক হাসবে; বলবে—'বেণী-মোক্তারটা গাধা!' শিবুও তাই চায়। বেণী-মোক্তার ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেল।

শিবুর সঙ্গে যখনি দেখা হয় বেণী ফিস্‌ফিস্ করে বলে, 'ভাই শিবু, আমার টাকা?'

শিবু হেসে বলে, 'বেণী ভাই, বুড়ো হয়ে তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? টাকা আবার আমি কবে নিলুম?'

বেণী রেগে বলে, 'দেবে না তাহলে? আচ্ছা আমিও দেখে নেব।'

শিবু হা হা করে হেসে বলে, 'বেশ তো, মকদ্দমা কর না, হ্যাণ্ডনোট্ আছে নিশ্চয়?'

বেণী রাগে দাঁত কড়মড় করতে করতে চলে যায়।

ক্রমে কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, বেণীর পঞ্চাশ টাকা

শিবু-মোক্তার বেবাক ঠকিয়ে নিয়েছে। সবাই আহ্লাদে আটখানা, ভাবলে—'আহা, কাকের মাংসও কাকে খায়?' বেণীকে সকলে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—'হ্যাঁ দাদা, তুমি নাকি লেখাপড়া না করেই শিবুকে টাকা ধার দিয়েছিলে? শেষে তোমার এই দুর্বুদ্ধি হল?'

বেণী কিন্তু কিছুতেই মানতে চায় না, ঘাড় নেড়ে বলে, 'আরে না না, ওসব শিবেটার মিথ্যে কথা। দাঁড়াও না, শিবেকে আমি—'

যখন একলা থাকে তখন শিবুর পেজোমির কথা ভেবে দাঁত কড়মড় করে আর গালাগাল দেয়।

এমনিভাবে টাকার কথা ভেবে ভেবে বেণী অসুখে পড়ল। একে বুড়ো বয়স তার উপর টাকার শোক—বেণী যায় যায়। ডাক্তার বদ্যিরা তার অবস্থা দেখে আশা ছেড়ে দিলে।

বেণী কিন্তু তখনও টাকার আশা ছাড়েনি; কেবলই ভাবছে, কি করে শিবুর কাছে টাকা উদ্ধার করবে! তার আর অন্য চিন্তা নেই। যখন বদ্যি নাড়ী দেখে বললে—'হরি নাম কর! গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম! গঙ্গাজল মুখে দাও।' শেষে মরণের আর দেরি নেই দেখে বেণী শিবুকে ডেকে পাঠালে। শিবু এসে তার পাশে বসতেই বেণী আর সকলকে সরে যেতে বললে। সবাই সরে গেলে বেণী কট্‌মট্‌ করে শিবুর দিকে চেয়ে বললে, 'আমার টাকা?'

শিবু মনে-মনে হেসে বললে, 'কিছু ভেবোনা ভাই বেণী; তোমার টাকা ঠিক আছে। এখন হরি-নাম কর। তোমার ভাল-মন্দ একটা কিছু হলেই তোমার টাকা তোমার ছেলেকে দেব—তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে বৈকুণ্ঠে যাও।'

বেণী বললে, 'না, এখুনি দাও।'

শিবু বললে, 'এখন টাকা কোথায় পাব ভাই? কালই তোমার ছেলের হাতে দিয়ে দেব—তুমি ভেবো না।'

শিবু দেখলে মিনিট দশেকের মধ্যেই বেণী পটল তুলবে, সে বললে, 'আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি টাকা আনছি।' বলে সে চলে গেল।

নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে শিবু গম্ভীর ভাবে বসে রইল। তারপর বেণীর বাড়ী থেকে যখন মড়াকান্না উঠেছে, তখন সে আবার বেণীর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হল। যেন কতই শোক পেয়েছে এম্‌নি ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বেণীর ছেলেকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। বললে, 'আমি আর বেণী একমন একপ্রাণ ছিলুম; তাই শেষ সময়ে আমাকে দেখবে বলে বেণী ডেকে পাঠিয়েছিল। যাবার সময় বলে গেল—আমার ছেলে নেহাৎ ছেলেমানুষ—দেখবার কেউ নেই—তুমিই দেখাশোনা করো।—তা কিছু ভেবোনা বাবা, তোমাদের সব ভার আজ থেকে আমি নিলুম। বেণী আমার কাছ থেকে অনেক টাকা ধার নিয়েছিল, তা সে যাক গে, সে টাকা আমি তোমাকে দিলুম। হ্যাণ্ডনোটগুলো আমি সব ছিঁড়ে ফেলে দেব।'

পাড়া-পড়শী যারা ছিল তারা শুনে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—তাইত! কি আশ্চর্য! শিবুর সঙ্গে বেণীর এত ভালবাসা ছিল?

ক্রমে বিকেল হয়ে আসছিল; পাড়ার অনেক ছেলে-ছোকরা জুটে বেণীর মড়া কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে চলল। শিবুও বন্ধুত্বের খাতিরে সঙ্গে গেল। ইচ্ছেটা, বেণীর শেষ দেখে তবে বাড়ী ফিরবে।

গঙ্গার ধারে শ্মশানঘাটে যখন সবাই পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয় হয়; পশ্চিমের আকাশে আলো ঝিল্‌মিল্ করছে। মড়া নামিয়ে ছেলে-ছোকরারা কাঠের সন্ধানে বেরুল। শিবু বুড়ো মানুষ, তাই সে মড়া ছুঁয়ে ঘাটেই বসে রইল।

কেউ কোথাও নেই, শিবু একলাটি মড়ার চালি ধরে বসে আছে আর ভাবছে—বেণীকে কি ঠকানোই ঠকিয়েছি, টাকাকে টাকা পেলুম,

আবার বেণীটা মরেও গেল। এখন আমি একলাই মোক্তারি করব— আর আমায় পায় কে ?

মনের আনন্দে শিবু একটা বিড়ি ধরিয়েছে এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে প্রচণ্ড এক চড় খেয়ে শিবু প্রায় চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। ধড়মড় করে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ কোত্থাও নেই। বেণীর মড়া চালির উপর শুয়ে আছে।

কে চড় মারলে ?

শিবু জীবনে অনেক মড়া পুড়িয়েছিল, তাই শ্মশানে তার ভয় ছিল না। সে ভাবলে—এ কি হল ? তবে কি কোনো শকুনি কিম্বা গীধ তার গালে পাখার ঝাপটা মেরে গেল ? কিন্তু তাই বা কি করে হবে ? আকাশে তো একটাও পাখী নেই ! শিবুর বড়ই ভাবনা হল। সে সতর্কভাবে বসে মড়া পাহারা দিতে লাগল।

শিবু মড়ার পায়ের দিকটাতে বসেছিল, হঠাৎ মড়াটা এক পা তুলে ক্যাঁৎ করে তার পেটে এক লাথি কষিয়ে দিয়ে আবার যেমন ছিল তেমনি ভাবে শুয়ে রইল। লাথি খেয়ে শিবু 'কোঁক্' করে উঠেছিল, কিন্তু তবু সে সহজে ভয় পাবার পাত্র নয়। তার মনে হল, বেণীটা নিশ্চয় মরেনি, তাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবার এই ফন্দি বার করেছে। নইলে মড়া কখনো লাথি মারতে পারে ?

শিবু বেণীর নাড়ী টিপে দেখলে—নাড়ী নেই !—গা বরফের মতন ঠাণ্ডা। তখন বুকে কান রেখে দেখলে শব্দ হচ্ছে কি না। কিন্তু বুকও একেবারে নিস্তব্ধ।

এই দেখে শিবুর ভীষণ ভয় হল—বেণী যে মরে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, সুতরাং এ বেণীর ভূত না হয়ে যায় না। বেণী যে ভূত হয়েও সেই পঞ্চাশ টাকার কথা ভোলেনি তা বুঝতে পেরে শিবু উঠে পালাতে গেল। কিন্তু পালাবার যো ছিল কি ! যেই সে

মড়ার বুক থেকে মাথা তুলতে যাবে অমনি বেণীর মড়া তড়াক করে চালির উপর উঠে বসে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলে। শিবু গলা ছাড়াবার জন্যে যতই টানাটানি করে—বেণীর মড়া ততই তাকে জোরে আঁক্‌ড়ে ধরে। শেষে সেই শ্মশানের উপর মড়ায়-মানুষে দস্তুরমত কুস্তি বেধে গেল। এ ওঠে তো ও পড়ে, ও পড়ে তো এ ওঠে। শিবু যেই পালাতে যায় অমনি বেণীর মড়া তাকে লেঙ্গি দিয়ে ফেলে দেয়। শিবু 'বাবারে' 'মারে' 'গেলুম রে' করে চেঁচাতে লাগল আর মড়ার সঙ্গে লড়াই করতে লাগল।

কিন্তু ভূতের সঙ্গে শিবু পারবে কেন? বেণীর মড়া একেবারে নাছোড়বান্দা—কিছুক্ষণ পরেই শিবু ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে ছেলে-ছোকরারা কাঠ জোগাড় করে ফিরছিল, তারা শিবুর চীৎকার শুনে দৌড়ে এসে যে-দৃশ্য দেখলে তাতে তাদের বুকের রক্ত প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তারা দেখলে, বেণীর মড়া আর শিবু চালির উপর পাশা-পাশি গলা-জড়াজড়ি করে বসে আছে। মড়ার মুখে বিন্দুমাত্র বিকৃতি নেই, তার একটা হাত সাঁড়াশির মতন শিবুর গলাটি জড়িয়ে আছে। শিবুর মুখ ভয়ে নীল হয়ে গেছে, সে মাঝে মাঝে উঠে পালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু পালাতে পারছে না—বসে পড়ে ঠক্‌ঠক্‌ কাঁপছে।

শিবুর ছেলেও এসেছিল, তাকে দেখে শিবু ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল—'ওরে বাবা, শিগ্‌গির বাড়ী যা। পঞ্চাশটা টাকা বেণীর বৌয়ের হাতে দিয়ে আয়গে যা, নইলে আমাকে ছাড়বে না।'

শিবুর ছেলে বাপের অবস্থা দেখে বাড়ী দৌড়ল। আর সকলে আলো জ্বেলে চালি ঘিরে বসে রইল। পোড়াবার উপায় নেই, পোড়াতে হলে দুই মোক্তারকে একসঙ্গে পোড়াতে হয়। কারণ, বেণীর মড়া তখনো শিবুর গলা জাপ্‌টে ধরে বসে আছে।

পুষি ভুলোর বনবাস

গ্রামের ঠিক কিনারা থেকেই বলতে গেলে বন আরম্ভ হয়েছে। প্রথমটা ফাঁকা-ফাঁকা, এখানে একটা গাছ ওখানে একটা গাছ, তারপর ক্রমে নিবিড় জঙ্গল। বড় বড় ঝাঁকড়া-মাথা গাছ স্তম্ভের মতন আকাশের পানে উঠে গেছে, তাদের পাতায় পাতায় জড়াজড়ি মেশামেশি, ডালে ডালে পাক খেয়ে গেছে—কুস্তিগির পালোয়ানদের হাত পা যেমন পরস্পরের গায়ে জড়িয়ে যায়। নীচে ঘন ঘাস, লতা, কাঁটার ঝোপ, আর অন্ধকার। কত জন্তু এই গহন বনের মধ্যে আছে তার ঠিকানা নেই। হাতী আছে, বাঘ আছে, ভল্লুক আছে, অজগর তার বিরাট অনড় শরীর নিয়ে শুয়ে আছে। দিনেরবেলা কেউ তাদের দেখতে পায় না, রাত্রে গাঁয়ের লোকেরা শুনতে পায়—হঠাৎ নেকড়ের ক্ষুধিত চীৎকার, হরিণের ভয়ার্ত কান্না, ক্বচিৎ হাতীর শৃঙ্গনিনাদ, খট্টাসের খট্‌খট্‌ হাসি। আর দেখতে পায়—অন্ধকার বনের কিনারে জোনাকীর মত নীল-চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে অজগর।

কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে কোনো জন্তুর প্রবেশ-অধিকার নেই। তারা জানে, গ্রামে একটা ভয়ঙ্কর জিনিস আছে, আগুন। তাই তারা দূর থেকে নিস্ফল গর্জন করে সরে যায়, আগুনের কাছে আসতে পারে না। কিন্তু গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে কোনো মানুষ যদি রাত্রে বনের মধ্যে পদার্পণ করে—তার আর পরিত্রাণ নেই, বনের সতর্ক প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রাস করবে। এইভাবে দুই পক্ষই চিরদিন এই সীমানার মর্যাদা রক্ষা করে এসেছে।

গ্রাম আর বনের ঠিক মাঝপথে একটা প্রকাণ্ড গাছ একলা দাঁড়িয়ে আছে ; যেন সে এই সীমান্তের প্রহরী। তারই ছায়ায় একদিন দুপুরে পুষি আর ভুলো বসে ছিল। পুষি আর ভুলো গ্রামেরই বাসিন্দা—পুষির গায়ের লোম শাদা, ল্যাজটি কালো ; আর ভুলো আগাগোড়া শাদা। বছর দুই আগে পুষি যখন শিশু অবস্থায় এই গ্রামে আসে তখন ভুলো তার উপর ভারি বিরক্ত হয়েছিল—কিন্তু ক্রমে তাদের মধ্যে শত্রুতার ভাব কেটে গিয়েছে। এখন দু'জনে ভারি বন্ধুত্ব।

পুষি কিছুক্ষণ করুণভাবে বনের দিকে তাকিয়ে থেকে কাৎ হয়ে শুলো, তারপর পিছনের বাঁ পা দিয়ে কান চুল্‌কোতে-চুল্‌কোতে বললে, 'গাঁয়ে আর থাকতে ইচ্ছে করে না। ঘেন্না ধরে গেছে!'

ভুলো পিঠের লোমের মধ্যে একটা কুকুরে-মাছির অনুসন্ধান করছিল, বললে, 'আবার কী হল ?'

পুষি কান চুল্‌কোনো শেষ করে একটু গম্ভীর হয়ে বসে বললে, 'হবে আবার কি, তাই বলছি। আমরা বনের প্রাণী—বনই আমাদের ঘরবাড়ি, গাঁয়ে থাকা আমাদের পক্ষে বনবাস।'

ভুলো কুকুরে-মাছিটাকে ধরতে পারলে না, পুষির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, 'আজ আবার মার খেয়েছিস—না ? খুলেই বলনা বাপু, অত লজ্জা কিসের ?'

পুষি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'ছাখ ভুলো, মানুষকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। ওদের মতন নেমকহারাম জাত আর পৃথিবীতে নেই! নইলে ওদের জন্যে আমি কী না করেছি ? একবার ভেবে ছাখ দেখি!'

ভুলো আকাশের দিকে মুখ করে অনেকক্ষণ ভাবলে, কিন্তু পুষি মানুষ জাতির কী মহৎ উপকার করেছে তা ভেবে পেলে না। শেষে বললে, 'আজ কী হয়েছিল, শুনি ?'

নি! দীর্ঘ-দন্তঠাকুরের সন্তান! তোর বোনপো যদি তোকে একবার পায় তাহলে এমনি করে মাথায় একটি থাবা মেরে তোর দফা নিকেশ করে দেবে।' বলে ঠাট্টাচ্ছলে পুষির মাথার উপর নিজের ডান পায়ের থাবাটা রাখলে।

পুষি অমনি ফ্যাস করে উঠে বললে, 'খবরদার ভুলো! মাথায় পা দিয়েছিস কি আঁচড়ে নাক ছিঁড়ে দেব।'

ভুলো তাচ্ছিল্যভরে বললে,'আর বড়াই করিসনি! একবার যদি টুটি ধরে নাড়া দিই তাহলে আর উঠে দুধের পথ্যি করতে হবে না।'

দু'জনে কিছুক্ষণ দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। ভুলো সামনের পায়ের উপর মাথা রেখে মিটিমিটি চাইতে চাইতে একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল, এমন সময় দূর থেকে 'ভুলো' 'ভুলো' ডাক শুনে চমকে উঠল। এ তার মনিবের ডাক। ভুলো ঘেউ ঘেউ করে সাড়া দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

অনেকক্ষণ ভুলোর দেখা নেই। পুষি একলা বসে-বসে মানুষের হৃদয়হীনতার কথা ভাবতে লাগল। একটু কৃতজ্ঞতা কি তাদের নেই? কত ইঁদুর সে ধরেছে তা কি তারা জানেনা? গোলা একেবারে নি-ইঁদুর করে দিয়েছে। সেজন্য ধন্যবাদ দেওয়া তো দূরের কথা, একটু ভাল ব্যবহারও কি করেতে নেই! একটু দুধে মুখ দিয়ে ফেলেছিল বলে একেবারে চেলা-কাঠের বাড়ি মারা! পিঠটা ফুলে উঠেছে। দুত্তোর, মানুষ জাতটাই পাজি! ওদের সংসর্গে থাকতে নেই, তারচেয়ে বনবাস ঢের ভাল।

আর, বনবাসই বা কেন, বনই তার ঘর। সেখানেই তো তার আত্মীয়-স্বজন সব আছে। গাঁয়েই বরং সব পর।

এই সময় মুখখানি ভারি বিমর্ষ করে ভুলো তার পাশে এসে বসল। পুষি দেখলে, ভুলোর গলায় ছেঁড়া দড়ির ফাঁস তখনো ঝুলছে। সে

পুষি শিরদাঁড়ার উপর একটা জায়গা সাবধানে চাট্‌তে চাট্‌তে বললে, 'অন্যমনস্কভাবে দুধের কড়ায় মুখ দিয়ে ফেলেছিলুম, এই অপরাধ ! অমনি বাড়ীর বৌটা ছুটে এসে পিঠে এক ঘা চেলা-কাঠ বসিয়ে দিলে। আর, যেসব গালমন্দ দিলে সে আর তোর শুনে কাজ নেই।'

ভুলো গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে, 'তোর ঐ দোষ কিছুতেই গেলনা পুষি। কত বোঝালুম, কিছুতেই বুঝলিনা। আচ্ছা, রান্নাঘরে ঢুকতে যাস কেন ? আমার মতন ভদ্রভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিস না ?'

পুষি একটু গরম হয়ে বললে, 'আমি কি তোর মত ছোটলোক যে, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব ? আমার সর্বত্র গতি। জানিস, আমি কত বড় বংশের মেয়ে !'

ভুলো চাপা বিদ্রূপের সুরে বললে, 'না। তুই বলনা, শুনি।'

পুষি বনের পানে একবার তাকিয়ে খুব আমীরী চালে বললে, 'ঐ বনের রাজা কে—জানিস ?'

ভুলো মিটি-মিটি তাকিয়ে বললে, 'জানি—হাতী।'

পুষি বললে, 'ছাই জানিস, তুই একটা গাধা।'

'তবে কে—ভল্লুক ?'

'ভল্লুক !' পুষি নাক সিঁটকে বললে, 'ভল্লুক তো তার গোমস্তা। বাঘ ! বাঘ ! নাম শুনেছিস কখনো ?'

'শুনেছি। তা, বাঘের সঙ্গে তোর কী সম্বন্ধ ?'

পুষি ভয়ঙ্কর গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমি আর বাঘ একই বংশের। আমরা সবাই দীর্ঘ-দন্ত ঠাকুরের সন্তান—বুঝলি ? বাঘ সম্পর্কে আমার বোনপো হয়—চেহারার আদল দেখিসনি ?'

ভুলো হ্যা হ্যা করে হেসে বললে, 'পুষি, তুই থাম্—আর জ্বালাস্

একটু মুচকি হেসে বললে, 'কি ভুলো, বোষ্টম হলি নাকি ? গলায় কণ্ঠি পরেছিস যে ?'

ভুলো উদাসভাবে বনের দিকে তাকিয়ে রইল। পুষি জিজ্ঞাসা করলে, 'বেঁধে রেখেছিল বুঝি ?'

ভুলো সংক্ষেপে বললে, 'হুঁ।'

'কেন ? কী করেছিলি ?'

ভুলো বিরক্ত হয়ে বললে, 'করব আর কি—কিছু করিনি !—আচ্ছা, তুই-ই বল দেখি, তোর তো দু'বছর বয়েস হয়েছে, নেহাৎ বোকাও নস্,—বেঁধে রাখলে কেউ কখনো তেজী হয় ?'

'দূর! তা কখনো হয় !'

'তবে ? আমার মনিবের মাথায় ঢুকেছে যে, বেঁধে রাখা হয়নি বলে আমার তেজ কমে যাচ্ছে। কখনো শুনেছিস এমন কথা ? বেঁধে রাখলে যদি তেজ বাড়ত তাহলে নিজেরা গলায় দড়ি বেঁধে ঘরে বন্ধ থাকে না কেন ? মানুষগুলো সত্যি আহম্মক। আমার মনিব কী ঠিক করেছে জানিস ? আজ থেকে রোজ দিনেরবেলায় আমাকে বেঁধে রাখবে আর রাত্তিরে ছেড়ে দেবে। তাহলেই আমি ভয়ঙ্কর তেজী হয়ে উঠবো।'

পুষি মনে-মনে হেসে বললে, 'তাই বুঝি আজ তোকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল ?'

ভুলো মুখ গোমড়া করে বললে—'হুঁ। আমিও তেমনি দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছি।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'তুই ঠিক বলেছিস পুষি, মানুষগুলোর শরীরে এতটুকু মায়া-দয়া নেই। যতই ওদের দেখছি ততই আমার পিত্তি চটে যাচ্ছে। দু'বেলা দুমুঠো ভাত দিয়ে ওরা ভাবে যেন আমাদের কিনে নিয়েছে। একটু দরদ নেই, ভালবাসা নেই—আমরাই কেবল মালিকের জন্যে প্রাণ দিতে

ছুটি।' এই সময়ে একটা কুকুরে-মাছি ভুলোর ঘাড়ের কাছে কটাস্ করে কামড়ে দিতেই ভুলো খিঁচিয়ে উঠল, 'দূর হ, লক্ষ্মীছাড়া!' বলে সামনের দু'পা দিয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে তাকে মারবার চেষ্টা করতে লাগল।

পুষি ভুলোর গা ঘেঁষে এসে গলা খাটো করে বললে, 'ভুলু, চল আমরা জঙ্গলে পালাই।'

হঠাৎ মাছি ধরায় ক্ষান্ত দিয়ে ভুলো বললে, 'অ্যাঁ—?'

পুষি ভুলোর গলার দড়ি খুলে দিয়ে চুপি চুপি বলতে লাগল, 'আমরা তো বনের প্রাণী, বনই আমাদের ঘর। চল, আমরা এই শয়তান মানুষগুলোকে ফেলে নিজেদের দেশে চলে যাই। ওরা জব্দ হোক।'

ভুলো বললে, 'কিন্তু—'

পুষি বলতে লাগল, 'এখানে থাকলে তোর মালিক এসে আবার তোকে ধরে নিয়ে যাবে, দড়ি ছিঁড়েছিস বলে মারবে, তারপর আবার বেঁধে রাখবে। বুঝেছিস? দরকার কি তোর এত অপমান সহ্য করবার? তারচেয়ে চল দু'জনে বনের মধ্যে থাকব, মনের আনন্দে জীব-জন্তু ধরে ধরে খাব—কারুর তোয়াক্কা রাখব না। সেখানে তো কেউ আমাদের চেলাকাঠ দিয়ে মারতেও আসবেনা আর দড়ি দিয়ে বাঁধবেও না। কী বলিস?'

পুষির কথায় ভুলোর মন প্রলুব্ধ হয়ে উঠল, তবু সে ইতস্ততঃ করে বললে, 'কিন্তু ভাই, মনিবকে না বলে ছেড়ে যাওয়া, সে যে নেহাৎ—'

পুষি বাধা দিয়ে বললে, 'কিসের মনিব? যে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে চায়, তার জন্যে আবার দরদ কিসের? এত লাথি-ঝাঁটা খেয়েও তোর মনিবের ওপর ছেদ্দা হয়? আমি হলে অমন মনিবের মুখে—'

'চুপ কর, ওকথা বলতে নেই, হাজার হোক মনিব। কিন্তু তবু তোর কথাটাও নেহাৎ মন্দ নয়—' বলে ভুলো ভাবতে লাগল।

পুষি বললে, 'বেশী ভাবিসনি ভুলু—চল এইবেলা বেরিয়ে পড়ি। শাস্ত্রে কী বলেছে জানিস তো—শুভস্য শীঘ্রং। এখনো অনেকক্ষণ বেলা আছে, এইবেলা গিয়ে জঙ্গলের ভেতরটা ভাল করে দেখে-শুনে নিতে হবে।—চল—ওঠ।' এই বলে পুষি বনের পানে পা বাড়ালে।

'চল তবে' বলে ভুলোও উঠে দাঁড়াল।

ঠিক এই সময় গাছের উপর থেকে ভারি গলায় কে বললে, 'ওদিকে যেওনা যাদু, হুতুম-থুমোর ভয়।'

পুষি চমকে গাছের দিকে চেয়ে দেখলে, একটা টিয়া পাখী বসে আছে। টিয়াটার পায়ে লোহার আংটি, বোধহয় কারুর শিক্‌লি ছিঁড়ে পালিয়েছে। পুষি রেগে উঠে বললে, 'আ মলো! শুভ কাজে বেরুচ্ছি অমনি পেছু ডাকলি? অযাত্রা কোথাকার! দুর্গা! দুর্গা! আয় ভুলো।'

পাখীটা কেবল টর্‌র্‌ করে হাসলে।

দু'জনে তখন বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। মানুষের মায়া কাটিয়ে যেতে ভুলোর মনটা একটু বিষণ্ণ হল বটে, কিন্তু আজ সে মালিকের ব্যবহারে প্রাণে বড়ই আঘাত পেয়েছিল, তাই আর গাঁয়ের দিকে ফিরে তাকাল না।

নিবিড় আবছায়া বনের ভিতর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে পুষি আর ভুলো শেষে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছল। একটি ছোট নদী লতাপাতা ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে—কিনারার গাছ তার জলের উপর ঝুঁকে পড়েছে। এখানে গাছের ভিড় কম বলে বিকেলের আলোও বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। দু'জনে

খানিকক্ষণ বসে জিরিয়ে নিলে ; অনেকদূর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে তাদের পিপাসা পেয়েছিল, জলের ধারে গিয়ে চক্-চক্ করে জল খেলে, তারপর একটা গাছের তলায় এসে বসল।

পুষি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, 'ভুলো, বেশ ক্ষিদে পেয়েছে —না রে ? এই সময় একটু দুধ পাওয়া যেত ?'

ভুলোরও ক্ষিদে পেয়েছিল কিন্তু সে তা বললে না, কেবল একটা 'হুঁ' বলে চুপ করে রইল। পুষি বললে, 'কিন্তু কী আশ্চর্য দেখেছিস ? জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এতদূর এলুম, জনপ্রাণীরও দেখা পেলুম না। জঙ্গলে কি কেউ থাকেনা নাকি ?'

এই সময় গাছের উপর থেকে শব্দ হল, 'হুঁশিয়ার ! পেছনে তাকাও।'

দু'জনে একসঙ্গে পিছু ফিরে দেখলে একটা প্রকাণ্ড কালো ভল্লুক পা টিপে-টিপে প্রায় তাদের ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে ! পুষি তো এক চীৎকার ছেড়ে তড়াক করে গাছে উঠে পড়ল ; কিন্তু ভুলো কী করে ? সে গাছে উঠতে জানেনা—প্রাণের দায়ে পোঁ পোঁ করে দৌড়তে আরম্ভ করল। ভল্লুকটাও দুলতে দুলতে আর গোঁ গোঁ করতে করতে তার পিছনে পিছনে ছুটল।

পুষি গাছে উঠেই দেখলে, সেই টিয়া ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসছে। পুষি তার কাছাকাছি যেতেই সে দূরের একটা ডালে উড়ে গিয়ে বসল, বললে, 'বনে জনপ্রাণী নেই কেমন ? তোমরা দু'জনে এখানে এসে রাজত্ব করবে ভেবেছিলে—না ?'

পুষি নীচের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাবা ! খুব বেঁচে গেছি ! ভাগ্যিস গাছে উঠতে জানি, নইলে আমারও ভুলোর দশা হত।'

টিয়া চোখের উপর পাৎলা পর্দা টেনে দিয়ে বললে, 'ভল্লুকও গাছে চড়তে জানে—তুমি একলা নয় !'

পুষি ভয় পেয়ে বলল, 'অ্যাঁ! তবে কী হবে! যদি ভল্লুক ফিরে আসে!'

টিয়া গলার মধ্যে অবজ্ঞাপূর্ণ টর্‌র্ শব্দ করে বললে, 'এই বুদ্ধি নিয়ে জঙ্গলে বাস করতে এসেছ? তোমাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। ভল্লুক যদি গাছে ওঠে, পাৎলা ডালে গিয়ে বসবে—বুঝলে? ভল্লুক সেখানে যাবার চেষ্টা করলেই ডাল ভেঙে পড়ে যাবে।'

পুষি আর দেরী না করে একটি খুব সরু ডালে গিয়ে বসল। কি জানি, বলা তো যায়না। সাবধানের মার নেই।

ওদিকে ভুলো চোঁ-চাঁ দৌড় দিচ্ছে; কিন্তু ভল্লুক তাকে ধরলে বলে, আর দেরী নেই। ভল্লুককে দেখলে মনে হয়না যে, সে দৌড়তে পারে, কিন্তু তার ঐ ঝাঁকড়া কালো শরীরটা দরকার হলে হরিণের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ভুলোর আর প্রাণের আশা নেই: সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, ভল্লুক ঠিক তার দু'হাত পিছনে এসে পড়েছে, হাত বাড়ালেই ধরে ফেলবে!

কিন্তু ঠিক সেই সময় এক আশ্চর্য ব্যাপার হল। ভল্লুকটা হাত বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ থপ্ করে বসে পড়ল। প্রায় পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গিয়ে ভুলো ঘাড় বাঁকিয়ে দেখলে, পিছনে ভল্লুক নেই। সে আরো খানিকদূর গিয়ে থামল। ফিরে দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করে দেখলে, ভল্লুকটা মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে, আর ভিতর থেকে একটা শব্দ বেরুচ্ছে—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—

ভুলো কিছু বুঝতে পারলে না; সে ভারি আশ্চর্য হয়ে অনেকখানি ঘুরে আবার সেই গাছের নীচে গিয়ে হাজির হল। গাছের দিকে তাকিয়ে দেখলে, পুষি সরু ডালের উপর চুপটি করে বসে আছে।

ভল্লুকের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে ভুলোর বেশ্ ফুর্তি হয়েছিল,

একটু অহঙ্কারও হয়েছিল। সে বললে, 'কী পুষি, গাছের টঙে উঠে বসে আছিস কেন? নেমে আয়। তোর মতন ভীতু দুনিয়ায় নেই।'

ভুলো যে বেঁচে ফিরে আসবে সে আশা পুষির ছিল না, সে চোখ গোল গোল করে জিজ্ঞাসা করলে, 'আরে ভল্লুক?'

ভুলো বললে, 'হুঁ—ভল্লুক! সে কি আর আছে? তার দফা রফা করে দিয়েছি।'

'সে কি? মরে গেছে? কী হয়েছিল?'

ভুলোর একটা দোষ, সে নিজের বীরত্বের বড়াই করতে ভালবাসে। বললে, 'মরেনি এখনো—তবে আর দেরী নেই। এমন এক লেঙ্গি মেরেছি তাকে যে আর ওঠবার ক্ষমতা নেই—মাটিতে শুয়ে কোঁ-কোঁ করছে।'

টিয়া বললে, 'জ্বর এসেছে। লেঙ্গি নয় রে, ভল্লুক জ্বরে ধুঁক্‌ছে। ভুলো, তুই বড় মিথ্যেবাদী—কুকুর জাতটাই মিথ্যেবাদী।'

ভুলোর একটু লজ্জা হল, টিয়ার উপর একটু রাগও হল কিন্তু সে-ভাব চেপে গিয়ে বললে, 'পুষি আয়, বড় ক্ষিদে পেয়েছে। শিকার ধরে খাই।'

পুষির পেট জ্বলছিল। সে সাবধানে নেমে এসে বললে, 'কী শিকার করবি? কোথাও যে কিছু নেই।'

ভুলো বললে, 'ওইদিক দিয়ে আসবার সময় দেখলুম কতগুলো খরগোস দূরে খেলা করছে—চল, দু'জনে মিলে ধরিগে।'

টিয়া টিটকিরি দিয়ে হেসে উঠল, 'হো হো হো! খরগোস ধরবে? আস্পর্ধা দেখে আর বাঁচিনা! খ্যাঁকশেয়ালী যার সঙ্গে দৌড়ে পারে না, নেকড়ের নাকের তলা দিয়ে যে পালিয়ে যায়, তাকে তোমরা ধরবে? হো হো হো! তারচেয়ে টিক্‌টিকি ধরে ধরে খাওগে যাও।'

টিয়ার উপর মনে মনে চটলেও পুষি আর ভুলো মুখে কিছু বললে না, কারণ টিয়ার কাছ থেকে অনেক উপকার পাওয়া যেতে পারে। এইমাত্র ভল্লুকের হাত থেকে সে-ই প্রাণ বাঁচিয়েছে ; তাই কোনো কথা না বলে তারা খরগোস-শিকারে চলল।

একটা উঁচু ঢিবির পাশে সারি সারি গর্ত; আর তারই সামনে ফাঁকা জায়গায় তিনটে খরগোস খেলা করছে। ডিগবাজি খাচ্ছে, কখনো বা এ-ওর পিঠে চড়ে ঘোড়া-ঘোড়া খেলছে।

উঁচু ঘাসের আড়াল থেকে তাদের দেখে ভুলো আর পুষির জিভে জল এল। পুষি ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'আমরা দু'জনে দু'দিক থেকে ওদের আক্রমণ করি আয়, তাহলে আর পালাতে পারবে না।' দু'জনে গুঁড়ি মেরে দু'দিকে চলে গেল। তারপর একসময় তাক্ বুঝে একসঙ্গে দু'দিক থেকে তীরের মত আক্রমণ করলে। খরগোস তিনটে তাদের আসতে দেখে একটুও ভয় পেলো না ; একটা খরগোস তার গন্নাকাটা ঠোঁট নেড়ে বললে, 'ছাখ তো, এরা আবার কারা ?'

দ্বিতীয় খরগোসটা ভুলোকে দেখে বললে, 'এটা বোধহয় কচ্ছপের ভায়রাভাই, নইলে এত আস্তে চলে কেন ?'

তৃতীয় খরগোস পুষিকে দেখে বললে, 'এটা নিশ্চয় কুমীরের ডিম ফোটা বাচ্ছা, এখনো চলতে শেখেনি।'

এতক্ষণে পুষি ভুলো একেবারে তাদের কাছে এসে পড়েছিল—ধরে আর কি ! কিন্তু এই সময় তিনটে খরগোসই হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে প্রায় চার-পাঁচ হাত শূন্যে উঠে গেল—ভুলো আর পুষি তাদের ধরতে পারলে না, তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল। দৌড় থামিয়ে তারা যখন ফিরে এল তখন খরগোসেরা ধীরে-সুস্থে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে আর মিহি সুরে গান ধরেছে—

'আমায় ধরতে পারলি না—ধিন্‌তা ধিনা—'

গর্তের মুখের কাছে বসে ভুলো জিভ বার করে হাঁপাতে লাগল, পুষি রাগের চোটে দাঁত কড়মড় করে বলল, 'আবার গান হচ্ছে! দাঁড়াও, গর্তে ঢুকে টুঁটি ধরে বার করে নিয়ে আসছি!' গর্তগুলো সরু হলেও পুষি কোনমতে তাতে ঢুকতে পারে।

টিয়া এতক্ষণ তাদের মাথার উপর উড়ে-উড়ে মজা দেখছিল, পুষি গর্তে ঢুকতে যায় দেখে বললে, 'অমন কাজটি করো না, গোলক-ধাঁধায় ঢুকলে আর বেরুতে পারবে না। অনেক মিঞাকেই ওর মধ্যে ঢুকতে দেখলুম, কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি।'

গায়ের ঝাল গায়ে মেরে রাগে গরগর করতে করতে পুষি আর ভুলো ফিরে এল। ক্ষিদেয় পেট চুঁই-চুঁই করছিল। নদীর ধারে দু'জনে পেট ভরে জল খেলে। কিন্তু জল খেলে কি ক্ষিদে যায়? পুষি বললে, 'ভুলো, কি খাব? পেট যে জ্বলে যাচ্ছে!'

ভুলো জবাব দিতে পারে না; টিয়া উপর থেকে বললে, 'টিক্‌টিকি খা—টিক্‌টিকি খা, তোদের কপালে আর কিছু জুটবে না।'

কোথায় খরগোস আর কোথায় টিক্‌টিকি! তবু পুষি মুখ তুলে বললে, 'টিক্‌টিকিই বা পাব কোথায় যে খাব?'

টিয়া বললে, 'কানা কোথাকার, দেখতে পাচ্ছিস না? ঐ ছাখ, —বলে চোখের ইসারা করে দেখিয়ে দিলে।

একটা কাঁটা-গাছের ডালে ডালে টিক্‌টিকি বসে ছিল, যেন ঝিঙের ঝাড়ে শুক্‌নো ঝিঙে ঝুলে আছে। তাই দেখে দু'জনে লাফিয়ে গিয়ে তাদের উপর পড়ল। পুষি থাবার এক ঝাপটায় একটা টিক্‌টিকি মাটিতে ফেলে কচ্‌মচ্‌ করে তার মাথা চিবুতে লাগল। ভুলোও অতিকষ্টে একটা রোগা টিকটিকি ধরলে, কিন্তু খেতে গিয়ে তার গা-বমি-বমি করতে লাগল; তবু পেটের জ্বালায় খেয়ে ফেললে। অন্য টিক্‌টিকিগুলো সর-সর করে নিমেষের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে

গেল। তারপর গাছের কোটরের ভিতর থেকে তাদের টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা শোনা গেল—সাবধান! হুঁসিয়ার! টরে-টক্কা টরে! একরকম অদ্ভুত জানোয়ার এসেছে; তারা আমাদের ধরে-ধরে খাচ্ছে। সাপ নয়—চারপেয়ে জন্তু! হুঁসিয়ার! কেউ গাছ থেকে নেবো না—টরে টরে টক্কা টক্কা—

দেখতে দেখতে টিক্‌টিকি-মহলে খবর রাষ্ট্র হয়ে গেল।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছিল; বনের অধিবাসীরা ক্রমে জেগে উঠছে, তার শব্দও মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছিল। পুষি টিক্‌টিকি-ভোজন শেষ করে ঠোঁট চাট্‌তে চাট্‌তে বললে, 'পেট ভরল না। আর গোটাদশেক হলে হত।'

ভুলো কিছু বললে না, কেবল করুণভাবে টিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল—যদি সে কোনো নতুন খাবারের সন্ধান দিতে পারে।

টিয়া পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে বললে, 'সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এবার আমি চললুম; রাত হলে আবার প্যাঁচার ভয়!'

টিয়া চলে যায় দেখে পুষি বললে, 'টিয়া, কোথায় খাবার পাওয়া যায় বল্‌না ভাই! তোদের দেশে নতুন এসেছি, তোরা যদি না সাহায্য করিস তাহলে বাঁচি কী করে?'

পুষি নরম হয়েছে দেখে টিয়া বললে, 'আজ আর হবে না, কাল সকাল পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকিস তাহলে ভাল খাবারের সন্ধান দেব। এখন যা, কোনো গর্ত-টর্ত দেখে লুকিয়ে থাকগে যা।'

পুষি মিনতি করে বললে, 'লক্ষ্মী ভাই, আজ যদি কিছু খেতে না পাই তাহলে শুকিয়ে মরে থাকব। জানিস তো, আমার দু'বেলা আধ-সের করে দুধ খাওয়া অভ্যেস। তার ওপর ভাত, মাছ, ইঁদুর আরও কত কী আছে।'

ভুলো কেবল লালায়িত জিভ বার করে টিয়ার পানে চেয়ে রইল।

তাদের অবস্থা দেখে টিয়ার মনে দয়া হল, সে একটু ভেবে বললে, 'ভাল খাবারের সন্ধান দিতে পারি। কিন্তু তোরা সেখানে যেতে পারবি? ভয়েই মরে যাবি!'

ভুলো তক্ষুণি লাফিয়ে উঠে বললে, 'মরব না। বল না কোথায়?'

টিয়া বললে, 'ঐ পশ্চিম দিকের শালবনের মধ্যে। বাঘ একটা হরিণ মেরে রেখে গেছে, আজ এসে খাবে। পারবি সেখানে যেতে? এ বনের কোনো জন্তু কিন্তু বাঘের খাবারে মুখ দিতে সাহস করে না।'

পুষি ল্যাজ ফুলিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তুই বোধহয় জানিস না, আমি সম্পর্কে বাঘের মাসি হই। ও হরিণ আমার জন্যেই আমার বোনপো মেরে রেখে গেছে। এতক্ষণ বলিস নি কেন? চল্ চল্, শিগ্‌গির আমাকে সেখানে নিয়ে চল্, আর দেরী করিস নি।'

টিয়া তখন টি টি করে হাসতে হাসতে উড়ে চলল, ভুলো আর পুষি তার পিছনে পিছনে গেল। শালবনের কাছে গিয়ে টিয়া বললে, 'এবার তোরা যা, আমি বাসায় চললুম। কাল যদি বেঁচে থাকিস তো দেখা হবে।' এই বলে সোজা নদী পার হয়ে উড়ে চলে গেল।

শালবনের মধ্যে ঢুকেই পুষি আর ভুলো মরা হরিণের গন্ধ পেল। পুষি বললে, 'দেখছিস, আমার বোনপো আমায় কত ভালবাসে? আগে থাকতে উয্যুগ-আয়োজন করে রেখেছে।'

ভুলোর তখন পুষির কথায় মন ছিলনা, এদিক-ওদিক চাইতেই দেখলে, আধ-খাওয়া হরিণটা পড়ে রয়েছে। সে উচ্চ-বাচ্য না করে খেতে আরম্ভ করে দিলে। পুষি আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঘুরে-ফিরে হরিণটার কোথায় নরম মাংস তাই খুঁজতে লাগল আর বলতে লাগল, 'উঃ, বোনপো আমাকে কী ভালোই বাসে! হাজার হোক দীর্ঘ-দন্তঠাকুরের সন্তান তো—উঁচু মেজাজ! খেয়ে নে ভুলো পেট ভরে, আমার পয়েই আজ খেতে পেলি।'

ভুলো কোঁৎ-কোঁৎ করে খেতে খেতে বললে, 'খা খা, বেশী বাজে বকিস্‌নি। বাজে কথা বলা তোর একটা অভ্যেস।'

পুষি জিভ দিয়ে রক্ত চেটে বললে, 'খাচ্ছি। তোর মতন অমন হাঁউ হাঁউ করে খেতে আমার সুখ হয়না।—কী সুন্দর হরিণের মাংস—যেন তুল্‌তুল্‌ করছে!' বলে পুষি মাংস ছিঁড়ে নিয়ে খেতে লাগল।

এতক্ষণে একেবারে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, শালবনের মধ্যে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ভুলোর পেট যখন বেশ ভরে এসেছে—তখনো পুষি ভাল করে আরম্ভ করেনি—এমন সময় 'গাঁক্‌' করে একটা বিরাট শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে মড়মড় শব্দ—যেন ঝোপঝাড় ভেঙে কে ছুটে আসছে! দু'জনে ফিরে দেখলে, আগুনের ভাঁটার মতন দুটো চোখ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসছে!

তারপরেই গর্জন শুনলে—কে রে! কে রে! আমার খাবারে মুখ দিয়েছে কোন্‌ হতভাগা! আজ তার বুক চিরে মেটুলি বার করব! তারপর আবার গাঁক্‌ গাঁক্‌ শব্দ!

শুনেই পুষির গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, সে ল্যাজ উঁচু করে পোঁ-পোঁ করে দৌড় দিলে। ভুলোও দৌড়ে, কম নয়—দু'জনে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে মরি-কি-বাঁচি করে পালাতে লাগল।

রাত্রে বেড়াল কুকুর দেখতে পায় বটে, কিন্তু বনের রাস্তা-ঘাট তাদের পরিচিত ছিলনা, তার উপর বাঘ পিছনে তাড়া করে আসছে। তাই দু'জনে যে কোথায় যাচ্ছে তার ঠিকানা ছিলনা। প্রাণের দায়ে খালি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছিল।

পালাতে পালাতে হঠাৎ তারা ঝুপ্‌ করে জলের মধ্যে পড়ে গেল। পুষি হাবুডুবু খেতে খেতে বললে, 'গেলুম রে, বাবারে, ও ভুলো এ কোথায় পড়লুম? কুয়ো নয় তো?' পুষি আগে একবার কুয়োয় পড়েছিল, সেই থেকে তার কুঁয়োয় বড় ভয়।

ভুলো চার-পায়ে সাঁতার দিতে দিতে বললে, 'কুয়ো নয়—নদী। সাঁতার কাট্—সাঁতার কাট্!'

জলে হাবুডুবু খেয়ে নদীর কিনারা কোন্‌দিকে তা তারা দেখতে পেলেনা, তবু সাঁতার কেটে চলল। ক্রমে নদীর স্রোত তাদের টেনে নিয়ে চলল। খানিক পরে তারা শুনতে পেলে বাঘ তীরে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় বলছে—খুব বেঁচে গেলি, যা!

এতক্ষণে ভুলো আর পুষি বেশ দেখতে পাচ্ছিল, তারা আর তীরের দিকে গেলনা; তীর থেকে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে স্রোতের মাঝখান দিয়ে ভেসে চলল। ক্রমে নদীর ঠিক মাঝামাঝি একটা উঁচু পাথর জেগে আছে দেখতে পেল। ভুলো বললে, 'ঠিক হয়েছে, আজ এখানেই রাত কাটাব। বেশ হবে, আর কেউ কাছে আসতে পারবেনা।' এই বলে ছোট্ট দ্বীপের মত সেই পাথরটার দিকে সাঁতরে চলল।

দু'জনে সেখানে গিয়ে উঠতেই এক কুড়ি ব্যাং কট্-কট্ করে আপত্তি জানিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল।

পুষি বেচারি ভিজে একেবারে আধখানা হয়েছিল, সে একটা উঁচু শুক্‌নো জায়গায় উঠে বসে হি-হি করে কাঁপতে লাগল। ভুলোও ভাল করে গা ঝাড়া দিয়ে তার পাশে এসে বসল, বললে, 'কী পুষি, দীর্ঘ-দন্তঠাকুরের সন্তানকে দেখে অমন ল্যাজ তুলে পালিয়ে এলি কেন? তোর বোনপো হয়, তোকে দেখলে গড় হয়ে পেন্নাম করে পায়ের ধূলো নিত, তা দিলিনা কেন? তোর জন্যে কত উয্যুগ করে রেখেছিল—একটু মুখেও দিলি না?'

পুষি চুপ—মুখে কথাটি নেই। ভুলোর পেট ভরা ছিল, সে একটা ঢেঁকুর তুলে বললে, 'আহা, তোর বোনপো তোকে সত্যিই ভালবাসে; নদীর ধার পর্যন্ত ডাকতে এসেছিল! গেলি নে কেন রে?'

পুষি ফ্যাঁচ্ করে হাঁচলে, জলে ভিজে তার ঠাণ্ডা লেগে গেছে। সে মনে মনে ভাবতে লাগল উনুনের ধারের সেই গরম জায়গাটির কথা, যেখানে সে রোজ সন্ধ্যাবেলা বসে ঘুমুত। নিজের দুর্বুদ্ধির দোষে খাবার পেয়েও আজ খেতে পারেনি—ভুলোটা পেট পুরে খেয়ে নিয়েছে—তাতেই তার আরো মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তার উপর ভুলো এমন ঠাট্টা স্থরু করে দিয়েছে যে, সহ্য করা দায়। পুষি বুকের মধ্যে ঘাড় গুঁজে চুপটি করে বসে রইল।

ক্রমে রাত গভীর হতে লাগল; ভুলো লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমোবার আয়োজন করলে। কিন্তু নতুন জায়গায় ঘুম সহজে আসেনা, এলেও ভেঙে যায়। নদীর দুই কিনারায় নানারকম জন্তু জল খেতে আসছে, তাদের ডাকাডাকিতে তন্দ্রা চটে যেতে লাগল। একবার একটা পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড হাতী শুঁড় দিয়ে চোঁ-চোঁ করে জল টেনে নিয়ে নিজের গলায় ঢেলে দিলে, তারপর ভেঁপু-ভেঁপু করে ডাক দিয়ে দুলতে দুলতে চলে গেল। তারপরে হরিণ এল, শূয়ার এল, ভল্লুক এল—সবাই জল খেয়ে গেল। শেয়াল জল খেতে এসে বললে, 'কে রে তোরা, নদীর টিলাতে ঘুপ্‌টি মেরে বসে আছিস?'

এরা জবাব দিলে না, শেয়াল তখন ভালভাবে লক্ষ্য করে বললে, 'আরে, এ যে পুষি আর ভুলো! আ মলো! তোরা মরতে বনে এসেছিস কেন?'

ভুলো পুষি কথা কইলে না, শেয়াল তখন খ্যাক্-খ্যাক্ করে হেসে বললে, 'কি রে ভুলো, একেবারে বোবা হয়ে গেলি যে! আর, আমি গাঁয়ের সীমানায় পা দিতে-না-দিতে যে ঘেউ ঘেউ করে গাঁ মাথায় করিস! এখন? এই বলে নদীর ধারে উপু হয়ে বসে শেয়াল উঁচু করে গান ধরলে। ইতিমধ্যে আরো অনেক শেয়াল এসে জুটেছিল, তারা দোয়ারকি স্থরু করলে—

'গাঁয়ের ভুলো ছিল গাঁয়ের গো-ভাগাড়ে,
ঘরের পুষি ছিল ঘরে—
হঠাৎ একি হল ! নদীর মাঝখানে
বসেছে টিলাটির 'পরে !
গাঁয়ের পোষা প্রাণী—খাস তো দুদু-ভাতু,
কেন রে এসেছিস বনে ?
এখানে থাকি মোরা স্বাধীন জাতি সব
বাঘা ও ভালুকের সনে।
গাঁয়েতে আছে শুধু মানুষ, গরু-ভেড়া,
আগুন, ঘুঁটে আর ধুঁয়া ;—
আমরা বনে থাকি স্বাধীন বেপরোয়া
—হুক্কা হুয়া হুয়া হুয়া !

সমস্ত রাত্রি তারা এই গান গাইলে। গান শুনে পুষি আর ভুলোর ভারি লজ্জা হল ! মনে মনে ভাবলে, প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু আর গাঁয়ে ফিরে যাব না।

ক্রমে অন্ধকার রাত্রি কেটে গেল, পূব দিকে উষার রাঙা শাড়ী গাছপালার মাথার উপর দুলতে লাগল। দু-একটা পাখী বাসা থেকে উড়ে এসে গান গেয়ে উঠল। সকাল হয়ে আসছে দেখে শেয়ালেরা গান বন্ধ করে বনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বেশ পরিষ্কার হতেই টিয়া উড়তে উড়তে এসে হাজির হল, বললে, 'আরে, তোরা এখানে! এখনো বেঁচে আছিস ? বেশ বেশ, তোদের ভাগ্যি ভাল !—তা, এখন কিনারায় চল, সকাল হয়েছে, এখন আর তত ভয় নেই।'

দু'জনে তখন সাঁৎরে কিনারায় উঠল। পুষি চিঁ চিঁ করে বলল, 'টিয়া ভাই, কাল থেকে কিছু খাইনি, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না।'

টিয়া বললে, 'কেন, কাল হরিণের মাংস খাসনি ?'

পুষি লজ্জায় মাথা হেঁট করে বললে, 'সবেমাত্র খেতে বসেছি, এমন সময়—'

ভুলো গম্ভীর মুখ করে বললে, 'এমন সময় বোনপো এসে পড়ল, তাই পুষি জিভ কেটে উঠে পড়ল। ছেলেপুলের খাওয়া না হলে মা-মাসির খেতে নেই জানিস তো ?' বলে ভুলো টিয়ার দিকে চোখ টিপলে।

টিয়া হেসে বললে, 'আহা, কাল তাহলে পুষির নিরম্বু একদশী গেছে ! আহা, আয় পুষি, আজ তোকে দ্বাদশীর পারণ করাবো।'

তখন সূর্য উঠেছে। টিয়ার পিছনে পিছনে দু'জন গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পৌঁছল। চারিদিকে বড় বড় গাছ—থামের মতন তাদের গুঁড়ি উপরে উঠে গেছে, তার উপর ডালপালা আর পাতার ঘন ছাউনি, এত ঘন যে আকাশ দেখা যায় না। টিয়া একটা গাছের ডালে বসে বললে, 'পুষি, এই গাছে ওঠ।'

পুষি অবাক হয়ে বললে, 'কেন, গাছে উঠে কী হবে ?'

টিয়া বলল, 'এই গাছের মগডালে বাজপাখীর বাসা আছে, তাতে ছানা আছে। তুই উঠে আয়, এখন তারা শিকারে বেরিয়েছে, এইবেলা তাদের ছানা খেয়ে তাদের বংশ নির্বংশ করে দে। ওরা আমাদের শত্রু—জ্ঞাতি-শত্রু—ওদের ডিম ছানা খেয়ে শেষ করে দে। এ বনে যত বাজপাখী আছে, সক্কলের বাসায় আজ তোকে নিয়ে যাব।'

পুষি আর দ্বিরুক্তি না করে গাছে উঠতে উঠতে বললে, 'টিয়া, তুই ভাবিস নি, তোর সব শত্রু আমি নিপাত করব। সত্যি কথা বলতে কি, পাখীর কচি-কচি ছানা খেতে আমি বড্ড ভালবাসি।'

ভুলো নীচে থেকে বললে, 'আমিও। পুষি, তুই একাই টিয়ার সব শত্রু নিপাত করিস নি, আমাকেও দু'একটা নিগাত করতে দিস।'

পুষি তখন অনেক উপরে উঠে গেছে, অবজ্ঞাভরে নীচের দিকে তাকিয়ে বললে, 'পাত-কুড়োনো হাড়গোড় যদি কিছু থাকে, ফেলে দেবঅখন।'

তারপর একে একে দশটা গাছে উঠে বাজপাখীর বাসায় যত ডিম আর ছানা ছিল পুষি সব সাবাড় করলে। ভুলো তলা থেকে যে প্রসাদ পেলে তাইতেই তার পেট ভরে গেল। শেষে আইঢাই করতে করতে পুষি নেমে এসে মাটিতে বসল।

টিয়া শত্রুর প্রতিহিংসা সাধন করে মনের আনন্দে একটি পাকা তেলেকুচা ডানহাতে ধরে খাচ্ছিল, বললে, 'কি পুষি, পেট ভরল ?'

পুষি প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে আলিস্যি ভেঙে বললে, 'হ্যাঁ। এখন একটু নিরিবিলি দেখে ঘুমুতে পারলে হয়।'

টিয়া তখন আধ-খাওয়া তেলাকুচোটা ফেলে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললে, 'শোন্ পুষি, এবার আস্তে আস্তে নিজের গাঁয়ে ফিরে যা, এ বনে আর থাকিস নি। তোদের ভালোর জন্যেই বলছি, আমি তো আর অষ্টপ্রহর তোদের সঙ্গে থাকতে পারব না! বনে যদি তোরা আর এক রাত্রি কাটাস তাহলে হুড়ার কিংবা বাঘের পেটে যাবি।'

পুষি টিয়ার কথায় কাণ না দিয়ে বললে, 'চল্ ভুলো, কোথাও শুয়ে একটু ঘুমুনো যাক। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি।'

টিয়া আবার বললে, 'পুষি ভুলো, আমার কথা শোন্, এখনো ফিরে যা, সন্ধ্যে নাগাদ গাঁয়ে পোঁছতে পারবি। আমিও একদিন মানুষের ঘরে ছিলুম, দাঁড়ে বসে ছোলা খেতুম। মানুষ জাতটা খামখেয়ালী বটে কিন্তু একেবারে হৃদয়হীন নয়। এখানে চারিদিকে বিপদ—জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ, গাছে ভল্লুক-বাঁদর। সবাই নিজের নিজের পেট ভরাবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোরা বনের হালচাল জানিস না—বেঘোরে মারা যাবি।

সকাল থেকেই ভুলোর মালিকের জন্য মন-কেমন করছিল, টিয়ার উপদেশ তার বড় ভাল লাগল। সে একটু কেসে বললে, 'পুষি, টিয়া যা বলছে তা মিথ্যে নয় ; চল্, ফিরে যাই—'

পুষির পেট ভরা ছিল, ভরা-পেটে পুষি কারুর কথা শোনেনা। সে বললে, 'তোর যেতে হয় যা, আমি এখন ঘুমুতে চললুম। গাঁয়ে ফিরলেই তো আবার সেই লাথি-ঝ্যাঁটা।' বলে সে আর-একটা আলিস্যি ভেঙে উঠে দাঁড়াল।

টিয়া উপর থেকে বললে, 'গুরুর কথা না শোনো কানে, প্রাণটি যাবে হ্যাঁচ্‌কা টানে! যা ভাল বুঝিস কর, আমি এখন চললুম, আমার ছানাদের খাওয়ানোর সময় হল।'

এই বলে টিয়া টি টি করে ডেকে উড়ে গেল।

এতক্ষণে প্রায় দুপুর হয়েছে, সূর্যের কিরণ সরু সুতোর মতন পাতার ফাঁক দিয়ে মাটিতে এসে পড়েছে। পুষি আর ভুলো ঘুমুবার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে শেষে একটি গরম অথচ নিরিবিলি ঝোপের মধ্যে এসে পৌঁছল। ঝোপের মধ্যে একটা লম্বা গাছের গুড়ি পড়ে ছিল। পুষি তার সামনে খানিক দূরে একটা পরিষ্কার জায়গায় গুঁড়িসুঁড়ি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। ভুলোর কিন্তু মন ছট্‌ফট্ করছিল, সে শুলো না, এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। গ্রাম যে কোন্ দিকে, বনের মধ্যে এত দৌড়োদৌড়ি করবার পর তা গুলিয়ে গিয়েছিল, তাই গাছপালা শুঁকে সে দিক্-নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগল।

ওদিকে পুষির বেশ ঘুম এসে গিয়েছে, সে চোখ বুজে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে দিয়েছে—এমন সময় তার মনে হল যেন আগুনের হল্কার মতন একটা নিশ্বাস তার গায়ে এসে লাগল, আর সেই সঙ্গে শুনতে পেলে কে যেন তার কানে-কানে বলছে—চলে আয়—আমার মুখের মধ্যে চলে আয়!

পুষি ধড়মড়িয়ে উঠে চোখ চেয়ে দেখলে, সেই গাছের গুঁড়িটা প্রকাণ্ড এক হাঁ করেছে, আর দুটো গোল গোল নৃশংস চোখ একদৃষ্টে তার পানে তাকিয়ে আছে।

আবার সেই গরম নিশ্বাস পুষির গায়ে লাগল, আবার সে শুনতে পেলে—চলে আয়—আমার মুখের মধ্যে চলে আয়!

পুষির মনে হল সেই নিষ্পলক নির্মম চোখ দুটো তাকে সেই হাঁ-করা মুখের দিকে টানছে। তার পালাবার ক্ষমতা নেই। পুষি অবশভাবে এক পা সেই দিকে এগিয়ে গেল, তারপর মর্মান্তিক আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল, 'মঁ্যা ও!'

ভুলো দূর থেকে সেই ভয়ার্ত ডাক শুনতে পেয়ে ছুটে এল। তারপর পুষির সামনে প্রকাণ্ড হাঁ-করা মুখ দেখেই বুঝলে, পুষি অজগরের সম্মোহন দৃষ্টির ফাঁদে পড়েছে। কাছে যেতে ভুলোর সাহস হলনা। সে দূর থেকে ঘেউ ঘেউ করে কয়েকবার ডাকলে—কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না, অজগরের চোখ পুষির উপর থেকে এক চুলও নড়ল না।

ভুলোর তখন মাথায় এক বুদ্ধি গজালো। হাজার হলেও পুষি তার বন্ধু, যেমন করে হোক তার প্রাণ বাঁচাতে হবে।

ভুলো ছুটে গেল অজগরের ল্যাজের দিকে, দেখল, ল্যাজের সরু ডগাটি কেবল লিক্-লিক্ করে নড়ছে। ভুলো প্রাণপণে ল্যাজের ডগায় মারলে এক কামড়!

ল্যাজে কামড় খেয়ে অজগরের চোখ মুহূর্তের জন্য পুষির চোখ থেকে সরে গেল। ব্যস্—সঙ্গে সঙ্গে পুষি একলাফে তিন হাত পেছিয়ে গিয়ে দৌড় মারলে। পুষি পালিয়েছে দেখে ভুলোও ল্যাজ ছেড়ে দিয়ে পুষির সঙ্গে দৌড়ল।

ছুট! ছুট! বন-বাদাড় পেরিয়ে, খানা-নালা ডিঙিয়ে দু'জনে

ছুটল। কাঁটায় গা ছড়ে গেল, পা কেটে গেল কিন্তু সেদিকে কারুর লক্ষ্য নেই। তাদের ভয়, সেই অজগরটা না ধরে ফেলে।

পুষি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, 'হে মা যষ্ঠি, এইবারটি রক্ষে কর্ মা, আর কখ্খনো এ পোড়া বনের ধারে আসব না। এইবারটি উদ্ধার কর।'

কিন্তু তাদের দুর্গতির তখনো শেষ হয়নি। অন্ধের মতন দৌড়তে দৌড়তে তারা পড়ল গিয়ে একপাল বীর হনুমানের মধ্যে। হনুমানেরা একটা ফাঁকা জায়গায় গোল হয়ে বসে মীটিং করছিল। একটা গোদা গম্ভীর ভাবে লেক্‌চার দিচ্ছিল, এমন সময় পুষি আর ভুলো হুড়মুড় করে পড়ল্ গিয়ে একেবারে তাদের মাঝখানে। হনুমানেরা চম্‌কে উঠল। একটা গোদা পুষির ল্যাজ ধরে টান মেরে তাকে দূরে ফেলে দিলে, আর একটা গোদা মারলে ভুলোর গালে টেনে এক থাবড়া। ভুলোর তো মুণ্ডু ঘুরে গেল ; সে গড়াতে গড়াতে উঠে আবার ছুটতে আরম্ভ করে দিলে, পুষিও 'ম্যাঁ—ও' বলে এক চীৎকার করে তার সঙ্গে-সঙ্গে ছুটল।

হনুমানদের মীটিংয়ে বিঘ্ন হওয়ায় তারা ভীষণ চটে গিয়েছিল, তাছাড়া কুকুর-বেড়াল তাদের চিরদিনের শত্রু। তারা হুপহাপ করে পুষি আর ভুলোকে তাড়া করলে।

দেখতে দেখতে বনের যেখানে যত হনুমান ছিল সবাই এসে পড়ল, তারাও কেউ গাছের ডালে ডালে, কেউবা মাটি দিয়ে পুষি ভুলোর পিছনে তাড়া করলে। পুষি একবার পিছু ফিরে দেখলে, কাতারে কাতারে হনুমান দাঁত খিঁচিয়ে ছুটে আসছে।

দৌড়তে দৌড়তে ভুলোর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, পুষির প্রাণ কণ্ঠার কাছে এসে ধুক্-ধুক্ করতে লাগল। পুষি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'ভুলো, আর দৌড়তে পারছি না, এবার গেলুম!'

ভুলোরও আর পা চলছিল না, সে কথা কয়ে শক্তিক্ষয় করলে না। যতক্ষণ ক্ষমতা আছে ততক্ষণ দৌড়বে এই মনে করে সে ক্লান্ত পা'গুলোকে জোর করে চালাতে লাগলো।

এদিকে হনুমানগুলো ক্রমেই কাছে এসে পড়েছে—আর আশা নেই! তাছাড়া, পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? শেষ পর্যন্ত তারা ধরে ফেলবেই। তবে আর কেন মিছিমিছি পালাবার চেষ্টা—তার-চেয়ে লড়ে মরা ভাল।

ভুলো ফিরে দাঁড়াবে মনে করছে, এমন সময় একটা ঝাঁকড়া গাছের ফাঁকে তার চোখ পড়ল—গ্রাম! গ্রাম! তাদের গ্রাম! ঐ যে দূরে ছাউনি দেওয়া ঘরগুলো পড়ন্ত রৌদ্রে দেখা যাচ্ছে!

ভুলো ঘেউ ঘেউ করে একটা আনন্দ-ধ্বনি করে বললে, 'পুষি! আর একটু—আর একটু দৌড়ে চল্! আমাদের গাঁয়ে এসে পড়েছি!'

পুষি চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু ভুলোর কথা শুনে তার আশা হল, সে দুমড়ে-পড়া পাগুলোকে আবার প্রাণপণে চালাতে লাগল।

দশ মিনিটে, অর্ধমৃত অবস্থায় একহাত জিভ বার করে ধুঁকতে ধুঁকতে পুষি আর ভুলো সেই গাছের তলায় এসে বসল—যে-গাছের তলা থেকে আগের দিন দুপুরবেলা তারা যাত্রা সুরু করেছিল। হনুমানেরা বনের কিনারা পর্যন্ত এসে দাঁত খিঁচিয়ে গালাগাল দিতে দিতে ফিরে গেল।

পুরো একটি ঘণ্টা জিরিয়ে নিয়ে পুষি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। বনের দিকে ফিরে ল্যাজটি গলায় দিয়ে গড় হয়ে নমস্কার করে বললে, 'এই তোমাকে গড় করছি—যতদিন বেঁচে থাকব আর ওমুখো হব না!—চল্ ভুলো, বাড়ী যাই।'

ভুলোর কিন্তু একটু লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল, মনিবের সঙ্গে বেইমানী করেছে এই ভেবে সে অধোবদন হয়ে রইল।

পুষির লজ্জার বালাই নেই, সে বললে, 'চল্ না, বসে রইলি কেন? ভয় করছে বুঝি?'

ভুলো বললে, 'ভয় করছে না। কিন্তু মনিবের কাছে কি করে মুখ দেখাব ভাই?'

পুষি বললে, 'এই জন্যে তোর ভাবনা? কিছু ভাবিসনে, আমি বলবঅখন যে তোকে পাহারাদার নিয়ে আমি বোনের বাড়ী নেমন্তন্ন রাখতে গিয়েছিলুম।—আয়।'

এই বলে পুষি গজেন্দ্রগমনে, যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে গাঁয়ের দিকে চলল। ভুলোও ঘাড়টি নীচু করে অপরাধীর মতন তার পিছনে পিছনে গেল।

উভয় সঙ্কট

যে-যায়গায় বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলাম, সেটা বাংলা আর বেহারের মাঝামাঝি একটা যায়গা। পাহাড় জঙ্গল আছে, কিন্তু যাকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বলে, অর্থাৎ খাঁটি বাঙালী বাঘ, এখানকার বাসিন্দা নয়। তবে মাঝে-মাঝে দু'একটা ছট্‌কে এসে পড়ে, অনেকটা বেহার-প্রবাসী বাঙালীর মতন।

গ্রামটি বেহারের এলাকার মধ্যে। বেশ বড় গ্রাম, বেশীরভাগ বাসিন্দা বেহারী। দু'চার ঘর বাঙালীও আছে। বাঙালীরা কয়েক-পুরুষ ধ'রে এখানে বাস করার ফলে প্রায় বেহারী হয়ে গেছে। মামাকে মামু বলে, কোঁচা দিয়ে কাপড় পরতে প্রায় ভুলে গেছে। তবে মাথায় পাগড়ীটা এখনও চড়ায়নি।

মোটের ওপর গ্রামের বাঙালী বেহারী অধিবাসীরা তাদের ক্ষেত খামার গরু-বাছুর নিয়ে বেশ সুখেই ছিল, কিন্তু হঠাৎ সোঁদরবন থেকে এক খাঁটি রয়েল বেঙ্গল এসে বড় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করেছে। গাঁ থেকে মাইল দুই দূরে একটা পুরোনো সহরের ভগ্নস্তূপ আছে, বাঘটা দিনেরবেলা সেইখানে লুকিয়ে থাকে, আর রাত্রে এসে গ্রামের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। সুবিধে পেলেই গরু ছাগল নিয়ে যায়। এমন কি, কিছুদিন আগে এক সন্ন্যাসী এসে গাঁয়ের এক গাছতলায় ছিলেন, রাত্রে বাঘ এসে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে তুলে নিয়ে গেছে।

গাঁয়ে ভারি আতঙ্ক। সূর্যাস্তের পর কেউ ঘর থেকে বেরোয় না। আমি যেদিন বিকেলবেলা গিয়ে পৌঁছলাম, গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই

এসে অভ্যর্থনা জানালো, 'হুজুর, বাঘের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করুন।'

সে-রাত্রে আর বাঘের সন্ধানে বেরুলাম না। আমার সঙ্গে আমার চাকর বাবুলাল ছিল, সে শিকারের সময় সর্বদা আমার কাছে থাকে। গ্রামবাসীরা আমাদের জন্যে একটা মেটে-ঘর খালি ক'রে দিলো, আমরা সেই ঘরে আস্তানা গাড়লাম।

সন্ধ্যের কিছু আগে আমি আর গ্রামের পাঁচজন ঘরে বসে বাঘের গল্প করছি, কে আমাদের পথ দেখিয়ে বাঘের সন্ধানে নিয়ে যাবে এইসব কথা হচ্ছে, এমন সময় একটি লোক এলো, এক গাল হেসে বললো, 'আমার নাম, মহিন্দর ঘোষ। আমি বাঙালী আছে।'

মহিন্দরকে দেখে মনে হয় বেশ তুখড় লোক। তার ভাষা একটু তেউড়ে গেছে বটে, কিন্তু প্রাণটা বাঙালীই আছে। সে মহা উৎসাহে বাঘের নানা কেচ্ছা শোনাতে লাগলো। বাঘের নাড়ী-নক্ষত্র তার জানা আছে। বাঘ ক'হাত লম্বা, তার বয়স কত, স্ত্রী-পুত্র আছে কিনা, সব মহিন্দরের নখদর্পণে। তার কথায় জানতে পারলাম, বাঘটি ছ'হাত লম্বা, বয়সে তরুণ এবং ঘোর ব্রহ্মচারী, অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি বাঘকে দেখেছো?'

মহিন্দর বললো, 'তবে আর বলছি কি হুজুর! একদিন ভোরবেলা মাঠে যাচ্ছিলাম, তখনও 'কিরিণ' ওঠেনি, হঠাৎ বাঘটা আমার বগল দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

অবাক হয়ে বললাম, 'বগল দিয়ে?'

'বিলকুল বগল দিয়ে হুজুর—বিশ হাতও হবেনা। আমি তো দেখেই জোরসে ভেগেছি। ভাগ্যে এ-বগল্লে একটা তালাও ছিল, তাইতে কুদে পড়লাম।'

বুঝলাম, মহিন্দরের বগল মানে বগল নয়—পাশ।

এদিকে সন্ধ্যে হয়-হয় দেখে গ্রামবাসীরা যে যার ঘরে ফিরে গেলেন। মহিন্দর কিন্তু র'য়ে গেল। ঠিক হলো কাল সকালে যখন বাঘের সন্ধানে বেরুব তখন মহিন্দর আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

গ্রামবাসীরা আমাদের প্রচুর খাবার দিয়েছিল। তাই খেয়ে আমরা সকাল-সকাল শুয়ে পড়লাম। ঘরের এক কোণে অনেক খড়ের আঁটি ডাঁই করা ছিল, তাই পেতে মাটিতে মহিন্দর লম্বা হয়ে শুলো।

অনেক রাত্রে একবার বাঘের গম্ভীর গর্জন শুনে ঘুম ভেঙে গেল। বাঘ যেন দূর থেকে বলছে—তুমি এসেছো আমি খবর পেয়েছি। আচ্ছা, দেখা যাবে।

পরদিন সকালবেলা আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। আমার হাতে রাইফেল, কোমরে জলের বোতল ঝুলছে, মহিন্দরের এক হাতে লম্বা বল্লম, অন্য হাতে খাবার-ভরা টিফিন বক্স; বাবুলালের কাঁধে আমার হোল্ডল্ আর হাতে একটা টোটাবন্দুক। শিকারে বেরুবার সময় সব রকম সম্ভাবনার কথা ভেবে তৈরী হয়ে বেরুতে হয়। কারণ, কোথায় কি বিপদ ঘটবে, কোন জঙ্গলে রাত কাটাতে হবে কিছুই ঠিক নেই। তাই আমার হোল্ডলে বিছানা, টিঞ্চার-আয়োডিন, ব্যাণ্ডেজ, মোমবাতি প্রভৃতি নানারকম জিনিস থাকে।

তিনজনে মাঠ ভেঙে চলেছি। মাইলখানেক যেতে-না-যেতেই দূরে প্রাচীন সহরের ভগ্নাবশেষ চোখে পড়লো। দেখে মনে হয় যেন একটা উঁচু ঢিবি, তার ওপর আগাছার জঙ্গল।

কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন উপস্থিত হলাম তখন দেখলাম, শুধু ঢিবি আর জঙ্গল নয়, বেশ একটি সাজানো সহর। ইট-পাথরের বাড়িগুলো

ভেঙে পড়েছে বটে, কিন্তু পথঘাট এখনও ঠিক আছে। কতদিন আগে এখানে মানুষ বাস করতো কে জানে! মনে হয়, ছয়-সাত শতাব্দী আগে এটা একটা সমৃদ্ধ নগর ছিল, তারপর হয়তো একদিন মহামারী দেখা দিয়েছিল, নগরের ওপর মৃত্যুর করাল ছায়া পড়েছিল। নগরবাসীরা দলে-দলে নগর ছেড়ে পালিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি। সেই থেকে নগর শূন্য প'ড়ে আছে আর আস্তে-আস্তে কালের কবলিত হচ্ছে। ভারতবর্ষের চারিদিকে এমনি কত যে নগরের ভগ্নাবশেষ প'ড়ে আছে তার শেষ নেই। মহেন্‌জো-দাড়ো, হরপ্পার কথা সবাই জানে, কিন্তু এইসব ছোটখাটো প্রত্নক্ষেত্রের খবর কেউ রাখেনা।

সে যাহোক, উপস্থিত আমাদের লক্ষ্য—বাঘ। কিন্তু সঙ্গে অনেকগুলো অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে, এগুলো ঘাড়ে ক'রে বাঘ খুঁজে বেড়াবার কোনও মানে হয়না। ভাগ্যক্রমে সহরে ঢুকেই একটা বেশ আস্তানা পাওয়া গেল। একটু উঁচু জমির ওপর পাথরের একটি ঘর, নিরেট গাঁথুনির জোরে এখনও অটুট আছে। এমন কি, তার মরচে-ধরা লোহার দরজা এখনও বন্ধ করা যায়। এই ঘরের মধ্যে আমাদের বাড়ির জিনিসপত্র রেখে কেবল অস্ত্র নিয়ে আমরা বেরুলাম।

সতর্কভাবে ভাঙা সহরের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলির ছাদ বেশীর ভাগই ধ্বসে পড়েছে, তবু দু'চারটি ঘর এখনও আস্ত আছে। বাঘটা বোধ হয় এমনি একটা ঘরে দিনেরবেলা লুকিয়ে থাকে।

কিন্তু অনেক ঘুরে-বেড়িয়েও বাঘের কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না। ভাঙা বাড়ি ভেদ ক'রে যে-সব গাছ গজিয়েছে তার ডালে ব'সে ঘুঘু ডাকছে; আর সব নিস্তব্ধ।

প্রায় দু'ঘণ্টা ধ'রে আমরা সহরটাকে চ'ষে ফেললাম, কিন্তু তবু বাঘের দেখা নেই। মাঝে-মাঝে বন্দুকের আওয়াজ করলাম কিন্তু বাঘের ছায়াটি পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। সন্দেহ হলো, বাঘ সত্যি আছে তো ?

মহিন্দরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হে, তোমার বাঘ কোথায় ?'

মহিন্দর বললো, 'আছে হুজুর। আমাদের দেখে বোধহয় সরম পেয়েছে, তাই সামনে আসছে না।'

ভাবলাম, ভারি লাজুক বাঘ তো! কিন্তু আমাদের দেখে এত লজ্জা কেন? আমরা তো আর তার ভাশুর নই!

আরও কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াবার পর এক যায়গায় এসে হঠাৎ একটা পচা গন্ধ নাকে এলো। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাঘের গা থেকে যে বোট্‌কা গন্ধ বেরোয়, এ-গন্ধ সে-গন্ধ নয়; পচা হাড়গোড়ের দুর্গন্ধ।

অমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখানে জলের একটা কুণ্ডের মতন ছিল। মাটি ফুঁড়ে জল বেরুচ্ছে; পুরাকালে এটা হয়তো একটা উৎস ছিল, নগরের মেয়েরা জলাধার থেকে জল ভরে নিয়ে যেতো। এখন জলাধার নেই, কিন্তু উৎস থেকে এখনও ক্ষীণধারায় জল বেরিয়ে চারিদিকের মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু দুর্গন্ধ আসছে কোথা থেকে? হাড়গোড় কোথাও দেখতে পেলাম না। তখন বাতাসের গতি অনুসরণ ক'রে যেদিক থেকে গন্ধটা আসছে সেইদিকে চললাম। রাইফেলের সেফ্‌টি-ক্যাচ্‌ টিপে রাখলাম; যদি বাঘ দেখতে পাই সঙ্গে-সঙ্গে ফায়ার করবো।

আন্দাজ, পঞ্চাশ গজ যাবার পর বুঝতে পারলাম, গন্ধটা আসছে অন্ধকার একটা ঘরের ভেতর থেকে। ঘরের দরজার যায়গায় একটা বড়গোছের ফুটো। আমরা বন্দুক বাগিয়ে পা টিপে-টিপে

গিয়ে উঁকি মারলাম। দেখি, সামনেই একটা মানুষের কঙ্কাল প'ড়ে রয়েছে।

কঙ্কালটায় এখনও অল্প-অল্প মাংস লেগে আছে। এদিক-ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, মুণ্ডুটা একপাশে গড়িয়ে পড়েছে। তাতে মাংসের লেশমাত্র নেই, কিন্তু জটার মত খানিকটা চুল মাথায় লেগে আছে।

মহিন্দর ফিস্-ফিস্ ক'রে ব'ললো, 'আরে, এ তো আমাদের সাধু মহারাজ!'

আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল বিশ্বাস হলো, বাঘ তাহ'লে আছে।

কিন্তু কোথায় বাঘ? এই ভাঙা সহরের গোলক-ধাঁধার মধ্যে তাকে খুঁজে বার করা মুস্কিল। ভয় হ'তে লাগলো, বাঘ মারতে এসে শেষে বাঘের হাতেই না মারা পড়ি। আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু সে হয়তো আমাদের ওপর নজর রেখেছে।

আমার আন্দাজ যে মিথ্যে নয় তা কিছুক্ষণ পরেই টের পেলাম। ঠাকুরের কঙ্কাল দেখে যে-পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরে যাচ্ছি, প্রস্রবণের ভিজে যায়গায় এসে লক্ষ্য করলাম—পাশাপাশি ছুটো প্রকাণ্ড থাবার দাগ! তাজা দাগ, আগে যখন এখানে এসেছিলাম তখন এ দাগ ছিলনা।

এর মানে, বাঘ জানতে পেরেছে যে আমরা এসেছি এবং নিজে আড়লে থেকে আমাদের অনুসরণ করছে। আমরা যখন উঁকি মেরে সন্ন্যাসী ঠাকুরের দেহাবশেষ দেখছিলাম, বাঘ তখন এখানে দাঁড়িয়ে আমাদের নিরীক্ষণ করছিল।

মহিন্দরকে বললাম, 'হুঁসিয়ার মহিন্দর, বাঘ পিছু নিয়েছে।'

মহিন্দর খৈনি খায়; এক চিম্‌টি খৈনি মুখে দিয়ে তাচ্ছিল্যভরে

বললো, 'আমি হুঁসিয়ার আছি হুজুর। হাতে যতক্ষণ বল্লম আছে, ততক্ষণ মহিন্দর ঘোষ বাঘের নানাকেও ভয় করেনা।'

মহিন্দর সাহসী লোক বটে। নিজের কথা বলতে পারি, রাইফেলের বদলে শুধু একটা বল্লম নিয়ে বাঘের সন্ধানে ঘুরে বেড়াবার সাহস আমার হতো না।

এদিকে বেলা দুপুর হয়েছে ; পেট জ্বল্‌তে আরম্ভ করেছে। আমরা আস্তানায় ফিরে চললাম। মাঝে-মাঝে হঠাৎ পিছু ফিরে দেখতে লাগলাম, বাঘ পিছনে আসছে কিনা। কিন্তু বাঘকে দেখতে পেলাম না।

আস্তানায় পৌঁছে আমরা টিফিন-বক্স নিয়ে বাইরে এলাম। ঘরের সামনে বেশ একটি পাথর-বাঁধানো দাওয়া ; বাবুলাল কম্বল পেতে দিলো। তার ওপর সকলে খেতে বসলাম।

এখানে ব'সে সামনের দিকটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক দাওয়ার নীচে একপাশে একটা কুয়া ; গোল ক'রে পাড় বাঁধানো। আগে বোধহয় গভীর ছিল, এখন ম'জে গিয়ে আট-নয় হাত নীচু একটা গর্ত আছে মাত্র, জল নেই। পাশ দিয়ে রাস্তা চ'লে গেছে ; রাস্তার ওপর সামান্য কাঁটা গাছ গজিয়েছে বটে কিন্তু তাতে দৃষ্টি আটকায় না। বাঘ যে গা-ঢাকা দিয়ে কাছে এসে পড়বে সে ভয় নেই। পিছন দিকে ঘর ; সেদিক দিয়েও বাঘের আচম্‌কা আক্রমণ আশঙ্কা করা যায় না। যায়গাটি মধ্যাহ্ন-ভোজনের পক্ষে বেশ নিরাপদ। কিন্তু তবু চারদিকে সতর্ক চোখ রেখে আমরা খেতে লাগলাম। বন্দুক হাতের কাছে রইলো।

প্রচুর খাবার ছিল ; তিনজনে মিলেও শেষ করতে পারলাম না। জল খেয়ে একটা সিগারেট ধরাবো মনে করছি এমন সময় বাঘকে প্রথম দেখতে পেলাম।

সামনে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে একটা চৌমাথার মতন ছিল, তারই পাশের দিকের গলি দিয়ে বাঘটা বেরিয়ে এলো। কী তার চলার ভঙ্গী—যেন রাজপুত্তুর। চৌমাথার মাঝখান পর্যন্ত এসে আমাদের দিকে চোখ তুলে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ালো। প্রকাণ্ড শরীর; কালো ডোরা-কাটা সোনালী গায়ে আলো পিছ্‌লে পড়ছে। আমাদের পানে এমনভাবে তাকিয়ে রইলো যেন আমাদের ধৃষ্টতা দেখে ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছে।

বন্দুক নিয়ে তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু তাগ্‌ ক'রে বন্দুক ফায়ার করবার আগেই সে যেদিক দিয়ে এসেছিল তার উল্টো দিকে বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু একটা চাপা কাশির মত আওয়াজ শুনতে পেলাম—গ্যাঁক্‌!

কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর মহিন্দর বললো, 'সাধুবাবাকে খেয়ে কি রকম তাগ্‌ড়া হয়েছে দেখলেন? গা দিয়ে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে।'

আমরা আবার কম্বলের ওপর বসলাম। পরামর্শ ক'রে একটা প্ল্যান্‌ ঠিক করতে হবে; সবাই মিলে একসঙ্গে বাঘের সন্ধানে ঘুরে বেড়ালে কোনও লাভ হবে না। পরামর্শে ঠিক হলো, বাবুলাল তার বন্দুক নিয়ে এই ঘরে লুকিয়ে থাকবে, যদি বাঘ দেখতে পায় গুলি করবে। আর আমরা দু'জন বেরুবো। আমি সামনে নজর রাখবো, আর মহিন্দর রাখবে পিছন দিকে। সন্ধ্যের আগে যদি বাঘের দেখা পাই ভালোই, নইলে আজ ফিরে যেতে হবে।

দু'জনে বেরুলাম। আমি আগে-আগে আর মহিন্দর আমার কয়েক পা পিছনে।

এবার বাঘের দেখা অনেকবার পেলাম। কিন্তু সে দেখা এতই ক্ষণিকের দেখা যে, বন্দুক তোলবার অবসর পাওয়া যায় না। কখনও

একটা ভাঙা বাড়ির পাশ থেকে তার প্রকাণ্ড মুণ্ডুটা দেখতে পাই ; কখনও ঝোপঝাড়ের মধ্যেই সোনালী বিছ্যৎ খেলিয়ে দিয়ে সে মিলিয়ে যায়। যেন আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

একবার একটা মোড় ঘুরে দেখলাম, বাঘ একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ; আমাদের দেখেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। ভাবলাম, এইবার পেয়েছি। ঘরের মধ্যে যখন ঢুকেছে তখন যাবে কোথায় ? বেরুতে হবে তো !

দরজা থেকে হাত-পঁচিশ দূরে একটা ইটের স্তূপের পিছনে লুকিয়ে বসলাম ; বন্দুক বাগিয়ে এমনভাবে বসলাম যাতে বাঘ বেরুলেই গুলি করতে পারি। মহিন্দর আমার পিছনে বসলো।

দশ মিনিট ব'সে আছি ; বাঘ ঘর থেকে বেরুচ্ছে না। ভাবছি, কী হলো ? হঠাৎ মহিন্দর 'ঐ ঐ' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠলো।

চমকে ফিরে দেখি, বাঘটা প্রায় ত্রিশ হাত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ফিরতেই একটু মুচ্‌কি হেসে লুকিয়ে পড়লো।

ভাগ্যিস মহিন্দর পিছন দিকে নজর রেখেছিল, নইলে বাঘটা মষ্টে-মষ্টে এসে ঘাড় মট্‌কাতো। কী ভয়ানক ধূর্ত বাঘ !

হঠাৎ সন্দেহ হলো, ছ'টো বাঘ নেই তো ! কিন্তু ছ'টো মদ্দা বাঘ তো কখনো একসঙ্গে থাকে না। তবে কি একটা বাঘিনী ?

মহিন্দর বললো, 'হুজুর একটাই বাঘ। আমি ওর চেহারা চিনি। নিশ্চয় ঘর থেকে বেরুবার অন্য রাস্তা আছে। একেবারে ছিপে রুস্তম বাঘ। আমাদের সঙ্গে দিল্‌লগি করছিল।'

মারাত্মক দিল্‌লগি !' ইয়ার্কিরও তো মাত্রা আছে !

এদিকে দিন ফুরিয়ে আসছে, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। আর বেশীক্ষণ বাঘের পিছনে ঘুরে বেড়ানো চলবে না। সন্ধ্যের পর এখানে থাকা মানেই, বাঘকে নৈশ-ভোজনের নেমন্তন্ন করা।

আমরা আস্তানার দিকে ফিরে চললাম। কাল আবার আসতে হবে। ছাগল না বাঁধলে এ-বাঘ মারা যাবে না।

মনে-মনে কালকের প্ল্যান ভাবতে-ভাবতে চলেছি, হঠাৎ একটা সামান্য ব্যাপার ঘটে সব প্ল্যানই উল্টে গেল। অন্যমনস্কভাবে উঁচু-নীচু যায়গায় পা ফেলে পা গেল মচ্‌কে। প্রথমটা তেমন কিছু বুঝতে পারিনি, কিন্তু দু'চার পা হাঁটতে-না-হাঁটতেই পা ভীষণ ফুলে উঠলো। এমন অবস্থা হলো যে, পা মাটিতে ফেলতে পারি না। তার ওপর বাঘের ভয়। অতি কষ্টে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে যখন আস্তানায় পৌঁছলাম তখন সূর্য প্রায় ডুবু-ডুবু।

ভেবে দেখলাম, খোঁড়া পা নিয়ে আজ আমার পক্ষে গ্রামে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। মাঠের মাঝখানেই রাত হয়ে যাবে, তখন বাঘের খপ্পরে পড়বো। যত অন্ধকার হবে, বাঘের চোখের জ্যোতি তত বাড়বে, আমাদের চোখের জ্যোতি কমবে। তখন আর বাঘকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তারচেয়ে এই ঘরটা আছে, লোহার দরজা বেশ মজবুত, এখানেই রাত কাটাবো।

মহিন্দর আর বাবুলালকে ব্যাপার বুঝিয়ে দিয়ে শেষে বললাম, 'তোমরা দু'জনে গাঁয়ে ফিরে যাও, আমি আজ রাত্রে এই ঘরেই থাকবো।'

মহিন্দর শিউরে উঠে বললো, 'একি কথা বলছেন হুজুর! এই সুন্‌সান্ যায়গায় একলা থাকবেন? বাঘ তো আছেই, তার ওপর যদি ভূত ঘাড়ে চেপে বসে?'

আমি বললাম, 'ভূতের চেয়ে বাঘকেই আমার ভয় বেশী। কিন্তু এ-ঘরে থাকলে বাঘ কিছু করতে পারবে না।'

বাবুলাল বেশী কথা কয়না, সে শুধু বললো, 'আমিও থাকি।'

আমি বললাম, 'না, তুমিও ফিরে যাও। প্রথমতঃ যা খাবার আছে তাতে দু'জনের কুলোবে না। তারপর মহিন্দরের পক্ষে শুধু

বল্লম নিয়ে এতটা পথ একলা যাওয়া নিরাপদ নয়। তুমি একটা বন্দুক নিয়ে সঙ্গে থাকলে দু'জনেই নিরাপদ হবে। কাল সকালেই আবার ফিরে এসো।'

বাবুলাল আর আপত্তি করলো না। হোল্ডল্ খুলে ঘরের এক কোণে আমার বিছানা পেতে দিলো।

যাবার সময় মহিন্দর আমার কানে-কানে ব'লে গেল, 'হুজুর, যদি গড়্‌বড়্ দেখেন, রাম-নাম করবেন।'

আমি হেসে বললাম, 'আচ্ছা। আর দেখ, নিজেদের জন্যে খাবার তো আনবেই, বাঘের জন্যেও একটা বড় দেখে পাঁঠা নিয়ে এসো।'

মহিন্দর আর বাবুলাল বেরিয়ে পড়লো।

ক্রমে অন্ধকার ঘোর হয়ে আসছে দেখে আমি ঘরের দরজা এঁটে বন্ধ ক'রে দিলাম। এই মৃত-নগরীর একটি কুঠুরীর মধ্যে আমাকে একলা রাত্রি কাটাতে হবে, তা কে জানতো? কিন্তু তখনও অনেক কথাই জানতাম না। সে রাত্রিটা যে কী ভয়ঙ্কর রাত্রি ছিল তা ভাবলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

মোমবাতি জ্বালিয়ে বিছানায় বসলাম। সঙ্গে এক শিশি মালিশ ছিল, তাই পায়ে ঘষতে লাগলাম। মচ্‌কানোর বেদনা এম্‌নিতে বেশী কষ্টদায়ক নয়, কিন্তু উঠে হেঁটে বেড়ালেই ব্যথা লাগে। আজ রাত্রিটা বিশ্রাম পেলে কাল নিশ্চয় ব্যথা অনেক কমে যাবে।

রাত্রি হলো। ক্লান্ত শরীর নিয়ে মিছি-মিছি জেগে থাকার মানে হয় না। খাওয়া সেরে নিলাম। তারপর সিগারেট ধরিয়ে ঘরটা একবার ঘুরে দেখে নিলাম। ঘরে সাপখোপ কিছু নেই। দেওয়ালে একটা ছোট্ট ঘুল্‌ঘুলি আছে, কিন্তু তা দিয়ে বাঘ তো দূরের কথা, বেড়ালও ঢুকতে পারে না। ঘুল্‌ঘুলি দিয়ে বাইরে তাকালাম, ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঝিঁঝিঁর ঐক্যতান ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যায় না।

সিগারেট শেষ ক'রে শুয়ে পড়লাম। মোমবাতিটা জ্বালা রইলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ পরে ঘুম ভাঙলো জানি না, বোধ হয় তখন দুপুর রাত্রি। চোখ খুলে দেখি, মোমবাতিটা শেষ হয়ে গিয়ে খাবি খাচ্ছে, নিভতে আর দেরী নেই। তারপরই যা চোখে পড়লো তা দেখে একেবারে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল।

না না, বাঘ নয়। দেখলাম, আমার বিছানা থেকে তিন-চার হাত দূরে মেঝের ওপর একটা মানুষ ডন্ ফেলছে। তার কোমরে কেবল একটা নেংটি, গায়ে ছাই মাখা, মুখে গোঁফ দাড়ি, মাথায় জটা—সে ক্রমাগত ডন্ ফেল্‌ছে আর ঘাড় ফিরিয়ে-ফিরিয়ে আমার পানে তাকাচ্ছে। তার চোখ দেখেই বুঝলাম, ইহলোকের মানুষ নয়। জ্যান্ত মানুষের দৃষ্টি অমন হয় না।

তারপর মোমবাতিটা একবার শেষ খাবি খেয়ে নিভে গেল।

ভয়ে শরীরের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। বিছানার ওপর শক্ত হয়ে ব'সে ভাবতে লাগলাম, এ কেমন ভূত? চেহারা অনেকটা সন্ন্যাসীর মত। তবে কি এ সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রেতাত্মা? কিন্তু তিনি রাত দুপুরে আমার ঘরে ঢুকে ডন্ ফেলছেন কেন?

ঘুল্‌ঘুলি দিয়ে একটু চাঁদের আলো আসছিল, বাইরে বোধ হয় চাঁদ উঠেছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে কিছু দেখা যায় না। যে এসেছিল, সে আছে না চলে গেছে? কিছুক্ষণ পরে সাহসে ভর ক'রে ডাকলাম, 'কে? কে তুমি?'

কোনও সাড়াশব্দ নেই—সব নিস্তব্ধ।

তখন একটু সাহস বাড়লো। ভাবলাম, ঘুম-চোখে ভুল দেখিনি তো?

আর একটা মোমবাতি জ্বাললাম। যিনি ডন্ ফেলছিলেন তিনি নেই। মোমবাতি হাতে নিয়ে ঘরের চারিদিক ঘুরে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই। লোহার দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ আছে।

ভূতই হোক আর চোখের ভুলই হোক, সাবধান থাকা দরকার। বাতিটা মাথার কাছে রেখে আবার বিছানায় শুলাম। রাইফেলে টোটা ভ'রে হাতের কাছে রাখলাম।

কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবার পর চোখ বুজে আসতে লাগলো। এমন সময় ছাদের কাছ থেকে একটা টিক্‌টিকি ডাকলো—ঠিক-ঠিক-ঠিক!

চমকে ঘাড় তুললাম। নজর পড়লো ঘুল্‌ঘুলিটার ওপর। দেখি, ফুটো দিয়ে একটা কোনও জন্তু ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে। রাইফেল তুলে সেইদিকে লক্ষ্য করলাম। তারপর যা দেখলাম তাতে বন্দুকটা প্রায় আমার হাত থেকে খ'সে পড়লো। জন্তু নয়, সন্ন্যাসীর জটাসুদ্ধ মাথাটা ঘুল্‌ঘুলির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে—

আমি কাঠ হয়ে ব'সে দেখছি, ক্রমে সেই ছোট্ট ফুটো দিয়ে সন্ন্যাসীর কোমর পর্যন্ত বেরিয়ে এলো। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! দেওয়াল থেকে একটা মানুষের ধড় বেরিয়ে আছে, নীচের দিকটা যেন দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা রয়েছে।

সন্ন্যাসী আমার পানে চেয়ে আছে, আর হাত-মুখ নেড়ে আমাকে যেন কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে! মাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে আমাকে যেন কিছু বলছে; তার ঠোঁট নড়ছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কথা শুনতে পাচ্ছি না দেখে সন্ন্যাসী ঘুল্‌ঘুলি থেকে নীচে লাফিয়ে পড়লো। ভয়ে আমার তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই। আমি বন্দুক তুলে ফায়ার করলাম।

বন্ধ ঘরে বন্দুকের আওয়াজ বোমা ফাটার শব্দের মতন শোনালো। কিন্তু সন্ন্যাসীর কিছুই হলো না। সে দু'হাত নাড়াতে নাড়াতে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

আমি এবার বন্দুক ফেলে লাফিয়ে উঠলাম। চীৎকার ছেড়ে দরজা খুলে বাইরের দিকে ছুটলাম।

কিন্তু বাইরেই কি উদ্ধার আছে! আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে; দাওয়া থেকে নেমেছি, দেখি হাত পঁচিশ দূরে বাঘটা থাবা গেড়ে ব'সে আছে!

সেই যে কথায় বলে, ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর, আমার সেই অবস্থা। ঘরে ভূত, বাইরে বাঘ। এখন আমি যাই কোথায়?

বাঘটা আমায় দেখে উঠে দাঁড়ালো, তারপর একপা-একপা ক'রে এগুতে লাগলো।

আমার তখন বাহ্যজ্ঞান বেশী নেই; অন্ধের মত পাশের দিকে পালাতে গিয়ে হোঁচট্ খেলাম। তারপর মনে হলো যেন গভীর গর্তে প'ড়ে যাচ্ছি।

গর্তটা কিন্তু বেশী গভীর নয়। দাওয়ার পাশে যে কুয়া আছে তা ভুলে গিয়েছিলাম। দেখলাম, নিতান্তই ভাগ্যবলে কুয়ায় পড়েছি।

পড়ার ঝাঁকানিতে বাহ্যজ্ঞান আবার ফিরে পেলাম। কুয়ার তলায় নরম মাটি ছিল, হাত-পা ভাঙেনি। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি, সবুজ কাচের মতন জ্যোৎস্না-ভরা আকাশ দেখা যাচ্ছে।

মনে হলো, ভগবান যা করেন ভালোর জন্য। কুয়ায় পড়া এমন কিছু সৌভাগ্য নয়, আমার ভাগ্যে শাপে বর হয়েছে। ঘরের ভূত আর বাইরের বাঘ কেউই এখানে নাগাল পাবে না।

পায়ের মচ্‌কানো ব্যথাটা এতক্ষণ টের পাইনি; এখন আবার টন্‌টন্ করতে আরম্ভ করেছে। তা করুক। কোনও রকমে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলেই সকালে বাবুলাল আর মহিন্দর আসবে—

কুয়ার দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে এইসব কথা ভাবছি, হঠাৎ ওপর দিকে ফোঁস্-ফোঁস্ শব্দ শুনে চোখ তুলে দেখি—ও বাবা! বাঘের হাঁড়ির মত মাথাটা কুয়ার কিনারা থেকে উঁকি মারছে!

আমি হলফ্ নিয়ে বলতে পারি, কোনও শিকারীর এরকম অবস্থা

কখনও হয়নি। শিকারী কুয়ার মধ্যে ব'সে আছে আর বাঘ ওপর থেকে তার মস্তক আঘ্রাণ করছে, এ-পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নতুন। বাঘটা কয়েকবার নুলো বাড়িয়ে আমাকে বোধহয় আশীর্বাদ করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সুখের বিষয়, আমার মাথার নাগাল পেলো না।

বাঘ যে কুয়াতে লাফিয়ে পড়বে সে ভয় নেই। বাঘ ভারি চালাক, সে জানে একবার এ গর্তে পড়লে আর উঠতে পারবে না। আমি নিশ্চিন্ত মনে ওপর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম—আহা, বন্দুকটা যদি ঘরে ফেলে না আসতাম! এখান থেকে বাঘকে গুলি করা তো ছেলেখেলা। বাঘ যেন গুলি খাবার জন্যই মুণ্ডু বাড়িয়ে আছে!

যাহোক রাতটা এইভাবেই কাটলো। বাঘ সারারাত্রি আমার মস্তক আঘ্রাণ ক'রে শেষে ভোর হচ্ছে দেখে মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে চ'লে গেল।

সকালে বাবুলাল আর মহিন্দর এলো। আমাকে কুয়া থেকে তুললো।

রাত্রির সমস্ত ব্যাপার শুনে মহিন্দর বললো, 'হুঁ, সাধুবাবাই বটে। আপনি যদি রাম-নাম করতেন তা'হলে আর কোনও বখেড়া হতো না।'

বললাম, 'রাম-নামের কথা মনে ছিল না।' নিজের নামটাই যে ভুলে গিয়েছিলাম সে-কথা আর বললাম না।

মহিন্দর বললো, 'যাহোক, সাধুবাবা কি বল্‌তে চান তা আমি বুঝেছি।'

'কী বুঝলে?'

'সাধুবাবার অপঘাত মৃত্যু হয়েছে; তাতে আত্মার সদ্‌গতি হয়নি। তাই তিনি আপনাকে সম্‌ঝাবার চেষ্টা করছিলেন, যেন তাঁর

অস্থিগুলো সমাধি দেওয়া হয়। সাধুদের দেহ পোড়াতে নেই, সমাধি দিতে হয়।'

এইসময় টিক্‌টিকি ডেকে উঠলো—ঠিক ঠিক-ঠিক।

মহিন্দর আঙুল তুলে বললো, 'শুনলেন তো! আপনি কিছু ফিকির করবেন না, সাধুবাবার ক্রিয়াকর্ম আমি করবো। কিন্তু বাঘের ব্যবস্থা কী হবে? বক্‌রা তো এনেছি।'

আমি রাত্রে ব'সে ব'সে বাঘ মারার যে প্ল্যান করেছিলাম, তাই বললাম।

তারপর আর কি? বাঘ মারতে একটুও কষ্ট হলো না। দিনটা ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে কাটালাম। তারপর যেই সন্ধ্যে হলো, অমনি বাবুলাল আর মহিন্দর আমাকে কুয়ায় নামিয়ে দিলে। আজ আমার সঙ্গে রইলো রাইফেল এবং ছাগল।

ক্রমে রাত্রি হলো, আকাশে চাঁদ উঠলো।

আমি মাঝে-মাঝে ছাগলকে কাতুকুতু দিচ্ছি আর সে ম্যা-ম্যা ক'রে ডাকছে।

তারপর ব্যাঘ্রমশাই এসে কুয়ার কিনারা থেকে উঁকি মারলেন। রাইফেল হাতেই ছিল, সঙ্গে সঙ্গে গুলি।

বাঘ যতই ধূর্ত হোক, বুদ্ধিতে সে মানুষের সমকক্ষ নয়। সে রাত্রে বাঘকে খুব সহজেই মেরেছিলাম। কিন্তু এই বাঘ মারা সম্পর্কে আমার যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা জীবনে ভুলবো না। একসঙ্গে বাঘ এবং ভূতের পাল্লায় পড়া বড় সহজ কথা নয়।